“বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।”

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com

IX
X
XI
IV
VII
VIII
medium

জনগণের
আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে
একসুরে বাঁধা
UNITED BANK OF INDIA
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

উত্তরসূরি

কার্তিক-পৌষ ১৩৮১ ॥ ২২ বর্ষ ১ম সংখ্যা

সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য

৯বি-৮ কালিচরণ ঘোষ রোড ॥ কলিকাতা ৫০

রবীন্দ্রনাথ : স্কেচ্

অ্যাবষ্ট্রাক্ট আর্ট ও রবীন্দ্র-চিত্রকলা

সোমেন বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের ছবির আলোচনায় য়ুরোপীয় অ্যাবষ্ট্রাক্ট আর্টের সঙ্গে এর সম্বন্ধ বিষয়ে কিছু আলোচনার দরকার আছে। কেননা দর্শক এবং সমালোচক অনেকেরই মনে প্রসঙ্গটিকে ঘিরে নানা প্রশ্ন জেগেছে দেখতে পাই।

য়ুরোপের আধুনিক মূর্তি বা চিত্রকলার প্রধান বৈশিষ্ট্য বিমূর্তভাব (আপাতত এই পরিভাষাটিই গ্রহণ করা যাক)। বস্তুত বিমূর্ত-গুণের অনুসন্ধান-চেষ্টার ফলেই প্রতীচ্য শিল্পের নতুন অধ্যায় শুরু। বহিরিন্দ্রিয়তা ও বস্তুরূপের প্রতি দাস্যভাব থেকে মুক্ত হবার ইচ্ছায় যে উদ্‌যোগ তার শেষের দিকের ফসল হলো অ্যাবষ্ট্রাক্ট আর্ট। য়ুরোপীয় শিল্পে বস্তুর অত্যাচারের ('tyranny') প্রতিক্রিয়ার প্রত্যন্তসীমায় এর জন্ম। ওদেশের অনুকরণধর্মী আর্টের পুরাতন পরম্পরার সঙ্গে সাম্প্রতিক বিমূর্তবাদী শিল্পের যে তফাৎ তার স্বরূপ সন্ধান করতে গেলে লক্ষ করা যায় যে, ভারতীয় শিল্পসুলভ তালমানভঙ্গি ওখানে নূতন মতে ও নূতন পথে আত্মপ্রকাশ করেছে। পুরানো কালের 'ফ্যাক্‌চুয়াল রিয়ালিটির' বশ্যতা কাটিয়ে নব্যশিল্প যে দিকে মোড় ঘুরেছে, আঙ্গিকের দিক থেকে ভারতীয় শিল্পের তা কাছাকাছি। চোখে-দেখা চেহারার গরিমা লুপ্ত করে দিতে যে বিচিত্র পন্থায় তুলিচালনা শুরু হয়েছে তাকে সংক্ষেপে এই ভাবে সাজানো যায়:

১. Geometric (জ্যামিতিক)

২. Ornamental (আলঙ্কারিক)

৩. Formalistic (রূপবাদী)
৪. Stylized (মুদ্রাশ্রয়ী)
৫. Schematic (নক্‌শা বা ছকধর্মী)
৬. Symbolic (প্রতীকী বা সাঙ্কেতিক)

তথ্যগত বাহুল্য বর্জনের মধ্যে দিয়ে বস্তুসত্তাকে স্ফুটতর করে তোলার জন্যে সারল্যের সাধনা করতে শিল্পীরা যাত্রা করলেন বিমূর্তবাদের বানপ্রস্থে। বোধহয় ভুল হবে না যদি বলি এক্‌স্‌প্রেশানিজম্‌ ক্রমশ বিবর্তনের ধাপে ধাপে অ্যাবষ্ট্রাক্ট এক্‌স্‌প্রেশনিজমে পর্যবসিত হয়েছে। শিল্পী পাউল ক্লে (Paul Klee) বা ক্যাণ্ডিনস্কি (Kandinsky) স্মরণীয়। মজার ব্যাপার, অ্যাবষ্ট্রাক্ট আর্টের ধারাও ক্রমশ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। প্রথমটিতে দেখি বস্তুতথ্যকে বাদ দিয়ে বস্তুসত্তাকে অর্থাৎ তার সারাৎসারকে ধরার চেষ্টা। সেখানে বস্তুটি আঁকা না হলেও তার সত্তাকে বেশ চেনা যায়। বরং তথ্য-বাহুল্যের কুয়াশা কাটিয়ে ভিতরের আসল রূপটি স্পষ্ট উঁকি মারে। কিন্তু অ্যাবষ্ট্রাক্ট আর্টের দ্বিতীয় চেহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাকে কোনো বস্তুরূপের নির্যাস বলা চলে না। সে বস্তু-ভারহীন সারল্যসাধনার বানপ্রস্থ নয়, একেবারে নির্বস্তুকতার সন্ন্যাসাশ্রম। সেখানে ছবি অশরীরী ভাবনার যাতায়াতের পদচিহ্ন, শিল্পীর মানসভ্রমণের মানচিত্র। ক্লে, ক্যাণ্ডিনস্কি এঁরা সব সেই শিল্পী যাঁরা দৃশ্য-অদৃশ্য, লৌকিক-অতিলৌকিক, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বোধবেদ্য দুই জগতের মাঝখানে বা কেন্দ্রে বসে সূক্ষ্ম ও গভীর অনুভূতিযোগে সব একাত্ম করে তোলেন। তাঁদের ছবিতে সিস্‌মোগ্রাফের রেখায় রেখায় সেই নিগূঢ় অনুভব স্পন্দমান।[১]

---

[১] 'The main purpose pursued by Kandinsky, Klee, Feininger was to simplify and deepen the romantic experience of cosmic unity.' Encyclopaedia of the Arts : Philosophical Library, New York.

কিন্তু 'এহো হয়, আগে কহ আর'। অ্যাবষ্ট্রাক্ট আর্টের পালা এখানে শেষ নয়। এমন বিমূর্ত শিল্প দেখা দিল যার সঙ্গে কোনো অনুভূতি, কোনো মননের সম্বন্ধ নেই, যা রূপের শুদ্ধতম প্রকাশ, যেখানে রেখা ও রং ভাবনা-নিরপেক্ষ আপন আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও প্রেরণায় আবর্তিত ও অভিব্যক্ত। ক্লে তাঁর কিছু ছবিকে নিছক রেখার নিরুদ্দেশ পদচারণ বলে আখ্যাত করেছেন।[২]

কিন্তু এখানেও কি শেষ? প্যারিসে ও বিচ্ছিন্নভাবে আমেরিকায় বিমূর্তবাদের একদল প্রবক্তা প্রেরণাহীন নিছক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে রেখা ও রং এর বিচিত্র চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন। জন হেলিয়ন (Joan Helion), ড্রিয়ার (Dreir) এই ধারার ধারক। গাণিতিক রেখার যান্ত্রিক আবর্তন এখানে ছবি নাম ধরেছে।

কিন্তু উগ্র অ্যাবষ্ট্রাক্ট আর্টের জয়যাত্রা ও প্রশস্তির পাশাপাশি এর সম্পর্কে নানা ধরনের সংশয় ও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে য়ুরোপে আর্টিষ্ট ও আর্ট ক্রিটিক দুই মহলেই। প্রশ্নগুলো জড়ো করলে সংক্ষেপে এইরকম দাঁড়ায়:

(১) অ্যাবষ্ট্রাক্ট আর্ট জীবনের কোন্ কাজে লাগবে?

(২) শুধুই অ্যাবষ্ট্রাকশন কি আর্ট হতে পারে?

(৩) বিশুদ্ধ অ্যাবষ্ট্রাক্ট আর্ট কি আদৌ সম্ভব? না, কথাটাই ধোঁকা, সোনার পাথর বাটি?

ভাস্কর এপ্‌সটাইন (Jacob Epstein) শিল্পের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে বিমূর্তবাদের সাময়িক উপযোগিতা স্বীকার করলেও জীবন-বিচ্ছিন্ন অ্যাবষ্ট্রাক্ট আর্টের যাথার্থ্যে সন্দিহান। জীবন ও শিল্পের সম্বিবিচ্ছেদে তাঁর বিশ্বাস নেই। তাঁর মুখে শুনি:

---

[২] 'Paul Klee has described some of his paintings as a line taking a walk'. An active line which freely wanders along, taking a walk for its own sake without any aim: Encyclopaedia of the Arts.

'I never saw the abstract as an end in itself, and I do not agree with the people who would divorce art entirely from human interest. Abstract work is extremely useful for experiment. Pure cubism is interesting and unprofitable in itself, but as laboratory work it has possibilities.........I am interested in humanity and not in abstract.'

The Sculptor Speaks : Jacob Epstein

জ্যামিতিক রেখাঙ্কণ ছবি হতে পারে ভাবের ছোঁয়া লেগে, ভাবের অভাবে সে শুধু ছকমাত্র। একজন বিদেশী সমালোচকের এই হলো বক্তব্য।

'The precision of geometric form aims more directly at the hidden clock work of nature, which more realistic styles represent in directly by its manifestations in material things and happenings. The concentrated statement of these abstractions is valid as long as it retains the sensory appeal of life that distinguishes work of art from a scientific diagram'.

প্রায় এ কথারই ধ্বনি শুনতে পাই শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের কণ্ঠে :

'নিছক প্রতীক নিয়ে তন্ত্রসাধনা চলে, শিল্পসাধনা তার চেয়ে বেশি কিছু চায়। তন্ত্রশাস্ত্রে একটা যন্ত্রচিহ্ন আছে সে কেবল প্রতীক—বিশেষ নামে অভিহিত কতকগুলো রং ও রেখার সমাবেশ—নিজে সে কিছু প্রতিমা নয়, ভাবও জাগায় না, ভক্তেরই কাজে লাগে। প্রতিমাশিল্পের কৌশলই হচ্ছে রূপটাকে ভাবের প্রতিম করে তোলাতে।'

বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী

এবার শোনা যাক কয়েকজন শিল্পরসিক বিদগ্ধ কলা-সমালোচকের কয়েকটি বিধ্বংসী মন্তব্য যা অ্যাবষ্ট্রাক্ট আর্ট সম্পর্কে গড়ে-তোলা অনেক সিদ্ধান্তের ভিত ভেঙে দেয়। উদ্ধৃতির দীর্ঘতা মার্জনীয়।

'Since the basic perceptual pattern carries the theme, we must not be surprised to find that art continues to fulfil its function even when it ceases to represent objects of nature. 'Abstract' art does in its own way what art has always done. It is not better than representational art, which also does not hide but reveals the meaningful skeleton of forces. It is no less good, for it contains essentials. It is not 'pure form' because even the simplest line expresses visible meaning and is therefore symbolic. It does not offer intellectual abstractions, because there is nothing more concrete than colour, shape, and motion. It does not limit itself to the inner life of man, or to the unconscious, because for art the distinction between the outer and inner world and conscious and unconscious mind are artificial. The human mind receives, shapes and interprets image of the outer world with all its conscious and unconscious powers, and the realm of the conscious could never enter our exprerience without the reflection of perceivable things. There is no way of presenting the one without the other. But the nature of the outer and inner world can be reduced

to a play of forces, and the 'musical' approach is attempted by the misnamed abstract artists.

We do not know what the art of the future will look like. But we know that 'abstraction' is not art's final climax. No style will ever be that. It is one valid way of looking at the world, one view of the holy mountain, which offers a different image from every place but can be seen as the same every where'.

Art and Visual Perception :
a psychology of the creative
eye. —Rudolf Arnheim.

'Indeed the use of the word 'abstract' in connection with art may very well have done a great deal of damage to our appreciation of many arts which are by no means abstract, but precisely the opposite.

Drawing, appreciation of the
Arts/3 Philip Rawson

Cubism ও fourth dimension প্রসঙ্গে গাণিতিক অ্যাবষ্ট্রাক্টের কথা :

Theories of the fourth dimension come obviously from abstract mathematics ill understood in a poet's or painter's brain. Fourth dimension is a definite mathematical abstraction and has nothing to do with art whatever, nor indeed can be imagined by a

painter who by his very gifts is the most bound of all persons to the three dimensions.

Modern French Painters
—Jan Gordon

আধুনিক আমেরিকান শিল্পীর প্রতিনিধিস্থানীয় তিনজনের কিছু উক্তি শোনা যাক :

'One of the abstract expressionists makes impersonal designs for a synagogue. The prophet is never abstract. ....What's abstract about food, liquor, sex or love ?' —Mark Tobey (1)

'I'm not interested in relation of colour or form.... I'm not an abstractionist. I'm interested only in expressing basic human emotions—tragedy, ecstasy, doom, and so on.' —Mark Rothko

'There's always a danger in opposing the current. My feeling about non-representational work is that it can be valuable as a discipline, but that it tends to become an end in itself rather than a means, and as an end in itself I can't. —George Tooker

Conversations with Artists—
Selden Rodman, New York

সবশেষে শোনা যাক শিল্পী পিকাসোর বক্তব্য :

Imagine, for example, a hunter in the abstract. What can he do, this abstract hunter ? In any case he won't kill anything.

Picasso says : Helene Parmelin

এবং এই প্রসঙ্গেই তাঁর মহামূল্য মন্তব্য যাকে অভিজ্ঞতাসঞ্জাত সত্যোচ্চারণ অর্থাৎ বাণী নাম দেওয়া যায় :

'What do you think an artist is? An imbecile who has only his eyes if he's a painter, or ears if he's musician, or a lyre at every level of his heart; if he's a poet or even he's a boxer, just his muscles? On the contrary, he's at the same time a political being, constantly alive to heartrending fiery or happy events, to which he responds in every way. How would it be possible to feel no interest in other people and by virtue of an ivory indifference to detach yourself from the like which they so copiously bring you? No, painting is not done to decorate apartments. It is an instrument of war for attack and defence against enemy.

—Picasso: Fifty years of his Art, by Alfred Barr, Jr. from a written statement by Picasso to Simone Tery.

মনস্তাত্ত্বিকেরা বলবেন 'অ্যাবষ্ট্রাক্ট আর্ট' নাম দিলে কী হবে বিশুদ্ধ অ্যাবষ্ট্রাক্টের ধারণা অর্থাৎ ভাবানুষঙ্গহীন বা association-নিরপেক্ষ কোনো মনন মানসিক দিক থেকে সম্ভব নয়। ভারতীয় দর্শনেও এর সমর্থন পাওয়া যাবে। গীতায় আছে, দেশকালের অধীন ব্যক্তি পঞ্চভৌতিক দেহের সসীম শক্তি নিয়ে দেশকালবর্ধিত বা সীমাতীত অব্যক্তের ধারণা করতে পারে না।*

---

* ক্লেশোঽধিকরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্

অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥

৫ম শ্লোক, ১২শ অধ্যায়, শ্রীমদ্ভগবতগীতা

ধ্যানের আলোচনায় প্রতীকোপাসনা প্রসঙ্গে আচার্য শঙ্করও বলেছেন যে দেহী তার সীমাবদ্ধ ধারণাশক্তি নিয়ে নিরুপাধি, নির্বিশেষ, নির্গুণ অমূর্তের ধ্যানে সহজে সমর্থ হয় না।[৪]

আজকাল তাই abstract art অস্বস্তিকর এই শব্দটির বদলে ব্যবহার করা হচ্ছে অন্য শব্দ non-objective art বা non-Figurative art।[৫] এই নতুন নামে উগ্র বিমূর্তবাদীর অবাস্তব তত্ত্বটিকে একটু পাল্টে একটু মোলায়েম ও সহজপাচ্য করে যে কথাটা বলার চেষ্টা থাকে, তা হলো এই যে, এ শিল্প আসলে কোনো জাগতিক বস্তুর রূপের কাছে ঋণী নয়, এখানে বিশুদ্ধ আবেগের (Pure emotion) প্রকাশ। কিন্তু প্রশ্ন এখানেও থেকে যায়। এবং দুটি সাংঘাতিক প্রশ্ন। প্রথম, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কোথাও যা নেই, এমন রূপ কি সত্যি শিল্পী আঁকতে পারেন? কলমের খোঁচায় তুচ্ছতম যে রেখাটি জন্ম নেয় অথবা তুলির আঁচড়ে সামান্যতম যে রঙের আভাসটি ফুটে ওঠে, তা জাগতিক রূপের বাইরে নয়। এমন কি অ্যাবষ্ট্রাক্টের কারবারী গণিতের যে অঙ্কচিত্র বা নক্শা

---

[৪] 'যাঁদের চিত্ত নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মে আসক্ত, তাঁদের সিদ্ধিলাভের জন্য সগুণ উপাসক অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশ পেতে হয়; কারণ নির্গুণ ব্রহ্মে নিষ্ঠালাভ করা দেহাভিমানী ব্যক্তিগণের পক্ষে অতিশয় কষ্টকর।'

বেদান্তভাষ্য

[৫] Non-figurative art: Its basis is the utmost purity of pictorial means inasmuch as it wants to give a work built up entirely on its own merits and laws, to be a uniqne creation in its own space. not intellectually associable to anything else in the world.

— Encyelopaedia of the Arts, Philosophical Library.

(diagram) বিজ্ঞানের বইয়ে স্থান পায়, তাও অ্যাবস্ট্রাক্ট নয়, একান্তই, কনক্রীট।* একথাটা মনে রাখা ভালো।

অর্থাৎ বিধাতার কাছে ধার না করে দৃশ্যময় জগৎটার গণ্ডীর একেবারে বাইরে পা বাড়ানো অসম্ভব।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, বস্তু সম্বন্ধহীন শুদ্ধ আবেগের সম্ভাব্যতা কি স্বীকার্য? তর্কের খাতিরে যদি 'হ্যাঁ' বলা যায়, তাহলেও প্রশ্ন ওঠে, শিল্পীর সেই শুদ্ধ আবেগকে দর্শকের কাছে পৌঁছে দিতে হলে কি ভাবানুষঙ্গ লাগে না? সুতরাং ভাবানুষঙ্গ বা association ছাড়া গতি নেই। তা ছাড়া প্রকাশ জিনিসটা নিতান্তই রূপনির্ভর। রূপ যেখানে নেই সেখানে প্রকাশও অনুপস্থিত। নামরূপাতীত যথার্থ বিমূর্ততা আর্টের চেয়ে বড়ো হতে পারে, কিন্তু আর্ট নয়। সুতরাং বিশুদ্ধ বিমূর্ততার বন্ধ্যাভূমি বা উচ্চভূমি থেকে নেমে না এলে শিল্প অসম্ভব। নির্গুণ ব্রহ্মকেও সৃষ্টিলীলায় নামতে গেলে সগুণ হতে হয়। নান্যঃ পন্থা। সৃষ্টি নামরূপের মায়ার অপেক্ষা রাখে।

তাই গোঁড়ামি ছেড়ে খোলা মনে চিন্তা করলে বলতে হয় তথাকথিত 'বিমূর্ত শিল্প' আসলে রূপের সারৎসার। Abstract art নামে যা চলে, তা বস্তুত চূড়ান্তভাবে simplified figurative art। সুখের কথা, পশ্চিমে কট্টর বিমূর্তবাদী আজ আর নেই, এবং এই সহজ সত্যটি অনেকেই মেনে নিয়েছেন যে অনুকরণধর্মী আর্টের হাঁফধরানো বদ্ধতা থেকে মুক্ত হবার আকুতিতে পশ্চিমী শিল্পী-সমাজের যে পথ হাতড়ানো, 'বিমূর্তবাদের চর্চা' তারই একটি অনিবার্য ও প্রয়োজনীয় পর্যায়। এবং ভাঙ্গনের পথে নতুন নতুন প্রকরণ ও ব্যাকরণের সন্ধান দিয়ে সৃষ্টির উপাদানের ভাঁড়ার ভরিয়ে তোলায় পশ্চিমী শিল্প এর দ্বারা বিপুলভাবে উপকৃত।

---

* Even a mathematical diagram in a text-book is not abstract but concrete. It is perceived as a concrete phenomenon, but interpreted symbolically.
Drawing, Philip Rawson
Oxford University Press.

২

এ আলোচনার আরম্ভেই বলেছি য়ুরোপের বিমূর্তবাদী আন্দোলন প্রিমিটিভ ও প্রাচ্য শিল্পের কাছে ঋণী। ভারতীয় শিল্পে প্রাচীন কাল থেকেই মূর্তি নির্মাণ ও চিত্র রচনায় বিমূর্তরীতি উপাদান হিসাবে কাজ করেছে। ভারতীয় সাহিত্যেও বিমূর্তভাবের প্রকাশ প্রাচীন কাল থেকেই দেখা যায়। বর্ণনায়, বিশেষত উপমা অলঙ্কারে এর ছড়াছড়ি। একটি আস্ত গজেন্দ্রকে বাদ দিয়ে তার গমনটুকুকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গজেন্দ্র গমনের কল্পনা ভারতীয় সাহিত্যে কতো অনায়াসে সম্ভব হয়েছে। যাইহোক, ভারতশিল্পে বাস্তবতার আকর্ষণে বিমূর্তভাবটি কোথাও ম্লান হতে দেখা যায় না। দৃশ্য, অদৃশ্য, লৌকিক, অলৌকিক দুই প্রান্তের মাঝ-খানটিতে দাঁড়িয়েছেন বলেই ভারতীয় শিল্পীরা প্রথাসিদ্ধ আঙ্গিকের অনুগত হয়েও বিচিত্র প্রাণস্পন্দনময় শিল্পসৃষ্টিতে সমর্থ। বিমূর্তভাব প্রধান হওয়ার জন্যেই ভারতশিল্পে ইন্দ্রিয়গত উদ্দীপনার অবকাশ স্বল্প। কথাটা সংক্ষেপে বোধহয় এইভাবে বলা যায় যে এদেশের শিল্পীরা নিছক চোখে-দেখা রূপের উপর ষোলো আনা ভরসা করেন নি কখনো। রূপের বারমহলে আটকে না থেকে অন্দর মহলে ঢুকতে চেয়েছেন, রূপের অতীত যা, ধ্যানকে কাজে লাগিয়েছেন। এইভাবে উপরতলার ওঠার সিঁড়ির দরজাটি চিরকাল খোলা থাকায় ভারতশিল্পকে পশ্চিমী শিল্পের মতো যেমন তথ্যের গোলামি করতে হয় নি, তেমনি তার কবল থেকে মুক্ত হবার জন্য বিশুদ্ধ অ্যাবষ্ট্রাক্টের মরীচিকার পিছনে ছুটতে হয় নি। মূর্তামূর্তের মিশ্রণ বলেই এদেশের শিল্প সাদৃশ্যকে উপেক্ষা করে নি। বস্তুরূপের বশ্যতা না থাকায় তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণাও অনাবশ্যক হয়েছে। চৈনিক শিল্পেও এ গুণটি বর্তমান। (বিশেষত সুং রাজত্বের চিত্রকলায়)। এক চীনা কবির কথায় 'Art produces something beyond the form of things though its importance lies in preserving the form of things.'

য়ুরোপের বিমূর্তবাদী নব্যশিল্পে এই সাদৃশ্য ভয়ানকভাবে উপেক্ষিত।

৩

আমাদের আলোচনার গোড়াতে 'অ্যাবষ্ট্রাক্ট আর্ট' শব্দের বাংলা তর্জমায় 'বিমূর্ত শিল্পকলা' এই অধুনা প্রচলিত পরিচিত প্রতিশব্দটি গ্রহণ করেছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিমূর্ত শব্দটি বিশেষ ব্যবহার করেন নি, করেছেন স্ব-উদ্ভাবিত অন্য তুটি শব্দ। 'বাংলাভাষা-পরিচয়' প্রবন্ধগ্রন্থে লিখেছেন :

'ইংরেজিতে বলে abstract……বাংলায় এর একটা নতুন প্রতিশব্দ দরকার। বোধকরি 'নির্বস্তুক' বললে কাজ চলতে পারে। বস্তু থেকে গুণকে নিষ্ক্রান্ত করে নেওয়া যে ভাবমাত্র, তাকে বলবার ও বোঝাবার জন্যে নির্বস্তুক শব্দটা হয়তো ব্যবহারের যোগ্য।'

দ্বিতীয় শব্দটি হলো 'অবচ্ছিন্ন'। প্রাসঙ্গিক আলোচনায় এদুটি শব্দকে কাজে লাগিয়েছেন দেখা যায়।

এতো গেল শব্দের কথা। এখন প্রশ্ন, নির্বস্তুকতার তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর মতামত বা ধারণা কী? রবীন্দ্ররচনায় এ বিষয়ে কোথাও এমন কোনো মন্তব্য আছে কিনা যাকে এ প্রসঙ্গে সাক্ষ্য মানা যায়?

রবীন্দ্রনাথের মত সন্ধান করার আগে তাঁর সাহিত্য থেকে কতকগুলি উদ্ধৃতি হাজির করছি, যেখানে ভাষারাজ্য abstract এর লীলা। কল্পনা কাব্যের 'বৈশাখ' কবিতার পংক্তিগুলি প্রথমেই মনে আসে :

'ছায়ামূর্তি যত অনুচর
দগ্ধতাম্র দিগন্তের কোন্ ছিদ্র হতে ছুটে আসে!
কী ভীষ্ম অদৃশ্য নৃত্যে মাতি উঠে মধ্যাহ্ন-আকাশে
নিঃশব্দ প্রখর
ছায়ামূর্তি তব অনুচর।' (বৈশাখ, কল্পনা)

এক চিঠিতে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে কবি নিজেই লিখেছেন :

'বৈশাখের অনুচরীর যে ছায়ানৃত্য দেখি সেটা অদৃশ্য নয় তো কী?

নৃত্যের ভঙ্গি দেখি, ভাব দেখি, কিন্তু নটী কোথায়? কেবল একটা আভাস মাঠের উপর দিয়ে ঘুরে যায়।···বৃহৎ ভূমিকার মধ্যে তরুরিক্ত বিশাল প্রান্তরে যে চঞ্চল আবির্ভাব ধূসর আবর্তনে দেখা যায়। তার রূপ নয়, তার গতিই অনুভব করি।'

এই রূপহীন গতির বর্ণনা বলাকাতেও:

'হে বিরাট নদী
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি
স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে'

(চঞ্চলা, বলাকা)

এখানেও 'নটী অলক্ষ্য সুন্দরী'।

বীথিকা কাব্যের 'ছন্দোমাধুরীর' বর্ণনাটি এইরকম—

'কর্কশের নৃত্য হানি
ছন্দোময়ী মূর্তিখানি
ঘূর্ণিবেগে আবর্তিয়া উঠে'। (ছন্দোমাধুরী, বীথিকা)

নৃত্য এখানেও, ছন্দের নৃত্য। কোনো বস্তুবিজড়িত ছন্দ নয়, বস্তু-বিবিক্ত। অর্থাৎ ছন্দের নির্বস্তুক চেহারা। লেখকের ভাষায় 'চিত্রবস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে ছন্দকে যদি ছন্দ হিসেবেই উপলব্ধি করতে ইচ্ছা করি তবে'—তবে তার এই ছায়ামূর্তি।

কাব্য ছাড়া অন্যত্রও অ্যাবষ্ট্রাক্টের অদ্ভুত অবতারণা রবীন্দ্রসাহিত্যে আছে। সে চেষ্টা দুঃসাহসিক। দুঃসাহসিক বলি এই কারণে যে অপ্রত্যক্ষের অবতারণা সাহিত্যের এমন শাখায় যার কারবার প্রধানত প্রত্যক্ষকে নিয়ে, যার সমস্ত নিবেদন দর্শনেন্দ্রিয়ের কাছে। নাটক, যাকে বলে দৃশ্যকাব্য, রবীন্দ্রনাথ তাকেই বেছে নিয়েছেন এই কাজে। 'রক্তকরবী'র রঞ্জন, রাজা বা অরূপরতনের রাজা এর দৃষ্টান্ত।

শিল্পে নির্বস্তুকতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কিছু বক্তব্য পাওয়া যাবে অধুনা সঙ্গীতচিন্তা-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'কথা ও সুর' প্রবন্ধে। সেখানে লিখেছেন :

'সঙ্গীতকলা বলো, চিত্রকলা বলো, মূর্তিকলা বলো, একান্ত স্বাতন্ত্র্যে আপন অবিমিশ্র বিশুদ্ধতা প্রকাশ করতেও পারে, স্বীকার করি। সঙ্গীতে যেমন যন্ত্রবাদন আলাপ বা আধুনিক কালে যেমন বিষয়-নিরপেক্ষ ছবি বা মূর্তি।' (কথা ও সুর, সঙ্গীতচিন্তা)

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সর্বত্রই সহিতত্বের (Communication) ওপর জোর দিয়েছেন। নির্বস্তুক শিল্প যদি অন্যের গোচরতাকে তোয়াক্কা না করে নিছক শিল্পীর ব্যক্তিগত খেয়ালখুশিরই প্রকাশ হয়, তবে সহিতত্বহীন সেই রচনা আর্টের কোঠায় পড়ে না। কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সেই বহুবিদিত মন্তব্য—

'একলা কবির কথা বলিতে এমন বুঝায় না যে তাহা আর কোনো লোকের অধিগম্য নহে, তেমন হইলে তাহাকে পাগলামি বলা যাইত।'

(রামায়ণ, প্রাচীন সাহিত্য)

সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ যেখানে অবচ্ছিন্নতার সাহায্য নিয়েছেন, সেখানে তাকে অন্যের মর্মঙ্গম করার ব্যবস্থায় ত্রুটি রাখেন নি। ডাকঘর, মুক্তধারা রক্তকরবী, রাজা প্রভৃতি রূপক-সঙ্কেত-আশ্রয়ী নাটকগুলি লক্ষ করলেই এটা স্পষ্ট হবে। সেখানে চরিত্র ও ঘটনা একদিকে যেমন অবচ্ছিন্ন, অশরীরী সত্যের অভিব্যক্তি, অন্য দিকে তেমনি প্রাকৃত জীবনধর্মের প্রকাশক। পাত্রপাত্রীগুলি নৈর্ব্যক্তিকতত্ত্ব হয়েও ব্যক্তিক সত্তায় সত্তাবান। এই দ্বৈতের যোগ অনুরূপতার যোগ নয়, বরং বলা যায় বৈসাদৃশ্যের যোগ। কিন্তু এ মিলে জোড়ের চিহ্ন নেই। এই দ্বৈধ অবচ্ছিন্ন তত্ত্বকে দুর্লক্ষ্য দূরবর্তিতা থেকে টেনে এনে পাঠকের অভিজ্ঞতার অন্তর্গত কাছের জিনিস করে তুলেছে। অর্থাৎ রবীন্দ্রসাহিত্যে অবচ্ছিন্নতা নিজেই একান্ত না হয়ে অন্যতম উপাদান হিসেবে উপস্থিত। মূর্ত এবং অমূর্ত একই মুদ্রার দুই পিঠ।

৪

রবীন্দ্রনাথের ছবির মধ্যে বিমূর্তভাবের সন্ধান করতে গেলে যে-জিনিষটি সর্বাগ্রে নজরে পড়ে তা হলো এই যে তাঁর ছবির যাত্রাই শুরু হয়েছে নির্বস্তুক রূপরচনার মধ্য দিয়ে। পাণ্ডুলিপির কাটাকুটির ভিতর থেকে যার জন্ম তা কোনো সুস্পষ্ট বিষয়াশ্রিত মূর্তি নয়, তার পিছনে কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয় ভাবনার প্রেরণা নেই। সেই অদ্ভুতের জন্ম সম্বন্ধে স্রষ্টা স্বয়ং যে মন্তব্য করেছেন, তার মধ্যে রূপরহস্যের মূল তত্ত্বটি চমৎকার প্রকাশ পেয়েছে। খাতার পাতায় রচনার কাটছাঁট করতে গিয়ে তাঁর মনে হলো যে একটি রেখা অন্য রেখার সঙ্গ কামনা করে, দোঁহে মিলে একাকার হতে চায়। এমনি করে রেখায় রেখায় সমন্বয়ের সৃষ্টি। পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাদেশের কলঙ্করেখা লক্ষ করলে ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে। সেখানে রেখার জুড়ি মিলিয়ে কতো ভঙ্গি, কতো আকার কতো কৌতুক। স্থির দুটি রেখার সাযুজ্যে অংকিতে অভাবিত গতিভঙ্গির জন্ম। তারপর যেখানে পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠা ছেড়ে সৃষ্টি এগিয়েছে, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের প্রারম্ভিক পর্যায়ে যাকে বলা যায় দ্বিতীয় স্তর, সেখানেও এই অনর্থক রূপের খেলা। ১৯২৮ এর কাছাকাছি ড্রইংগুলি লক্ষ্য করলে ধরা পড়বে শিল্পী অনেক সময় একটা ছন্দোময় প্রেরণার কাছে যেন নিষ্ক্রিয় আত্মসমর্পণ করেছেন। প্ল্যানচেটের রেখাঙ্কণের মতো অনেক ছবি চলমান বিন্দুর পদচিহ্ন।

এর পর দ্বিতীয় পর্যায়। এই পর্যায়ের রবীন্দ্রচিত্রকলায় ক্রমশ অর্থহীন আকার বাস্তবরূপে পরিচিত মূর্তি ধরে অবচ্ছিন্নতা থেকে জীবনের প্রত্যক্ষতায় উপনীত হয়েছে। এ পর্যায়ে অজস্র ছবিতে জীবজন্তু, ফুলপাতা, মুখাকৃতি, মনুষ্যমূর্তিসম্বলিত কম্পোজিশন, ভূদৃশ্যচিত্র চোখে পড়বে। এদের সংখ্যা কম নয়।

রবীন্দ্রচিত্রের পরিবর্ত্যমান ক্রমিকতার তৃতীয় বা শেষ পর্যায়ে আবার বস্তুরূপ থেকে অবচ্ছিন্নতায় প্রত্যাবর্তন। কিন্তু এ-ক প্রারম্ভিক পর্যায়ের

প্রাথমিক রূপের দ্বিরাগমন বলা যাবে না। এর স্বরূপ স্বতন্ত্র। মনে রাখতে হবে প্রথম ও শেষ পর্যায়ের মাঝখানে দ্বিতীয় পর্যায়ের বস্তুরূপচর্চার যে অভিজ্ঞতা তার প্রভাব তৃতীয় পর্যায়ে ক্রিয়াশীল। এখানে যে প্রবণতা লক্ষগোচর হলো তা বস্তুরূপের সরলীকরণ।[৭] জ্যামিতিক আকার ইত্যাদি তারই ফল। তৃতীয় পর্যায়ের বিমূর্তভাব প্রধানত ঐ প্রবণতাজাত। কোন্ মানসিকতা থেকে এই সরলীকৃত রূপচর্চার জন্ম তা বোঝা যাবে রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে। কথাগুলি চিত্রচর্চাপর্বের (১৯২৫—) সমকালীন।

'সত্যের রসরূপটি সুন্দর ও সরল করে প্রকাশ করা যে-কলাবিদ্যার কাজ অবান্তরের জঞ্জাল তার সবচেয়ে শত্রু। মহারণ্যের শ্বাস রুদ্ধ করে দেয় মহাজঙ্গল।

'আধুনিক কলারসজ্ঞ বলেছেন, আদিকালের মানুষ তার অশিক্ষিত পটুত্বে বিরল রেখায় যে-রকম সাধাসিধে ছবি আঁকত, ছবির সেই গোড়াকার ছাঁদের মধ্যে ফিরে না গেলে এই অবান্তর পীড়িত আর্টের উদ্ধার নেই। মানুষ বারবার শিশু হয়ে জন্মায় বলেই সত্যের সংস্কারবর্জিত সরলরূপের আদর্শ চিরন্তন হয়ে আছে, আর্টকেও তেমনি শিশু জন্ম নিয়ে অতি অলঙ্কারের বন্ধনপাশ থেকে বারে বারে মুক্তি পেতে হবে।

'এই অবান্তর বর্জন কি শুধু আর্টেরই পরিত্রাণ। আজকের দিনে ভারজর্জর সভ্যতারও এই পথে মুক্তি।'

(যাত্রী, ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২৫, ক্রাকোভিয়া।)

কিন্তু রবীন্দ্রচিত্রকলায় বিমূর্তভাবের যে প্রকাশ তা পাশ্চমী অ্যাবষ্ট্রাক্ট আর্টের সমগোত্র নয়। প্রথমত উভয়ের ইতিহাস স্বতন্ত্র। আগেই বলা হয়েছে য়ুরোপের অ্যাবষ্ট্রাক্ট আর্টের জন্ম যুগ যুগ অনুশীলিত অনুকৃতিমূলক আর্টের প্রবল প্রতিক্রিয়ায়। ভাবীসৃষ্টির বিপুল সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ হলেও

[৭] 'Simplification is the conversion of irrelevant detail into significant form.' —Art, Clive Bell

প্রধানত ভাঙনের পথেই এর আবির্ভাব। য়ুরোপের শিল্প-অভিব্যক্তির প্রাণিক নিয়মেই এটি ঘটেছে। কিন্তু আমাদের দেশে সে পটভূমি নয়। রিয়ালিজমের নাগপাশে এ দেশ কখনো শিল্পকলাকে বাঁধে নি। রবীন্দ্রমন সেই শিল্পবোধের পরিমণ্ডলেই পুষ্ট। শুধু দেশীয় বা জাতীয় ঐতিহ্যই নয়, জন্মরোমান্টিক কবির ব্যক্তিগত প্রবণতাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। স্বভাবতই পশ্চিমী নব্য শিল্পকলার দ্রোহবুদ্ধির বেগ ও আবেগ তাঁর মনে সঞ্চিত হবার কোনো কারণ ঘটে নি। এ হলো ইতিহাসের কথা।

দ্বিতীয় পার্থক্য রূপে। সংক্ষেপে বলা যায়, আত্যন্তিক মননজাত (Purely intellectual) বিশুদ্ধ বিমূর্ততার বা অ্যাবষ্ট্রাক্টের চর্চা না করায় এবং টান বা সংকর্ষ (Tension), বুনট (Texture) ও সাদৃশ্য এবং সর্বোপরি সহিতত্বের (Communication) প্রশ্নটি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত না হওয়ায় রাবীন্দ্রিক বিমূর্তভাবাশ্রিত রচনা য়ুরোপীয় আধুনিক অ্যাবষ্ট্রাক্ট আর্ট থেকে দূরেই রয়ে গেছে।

জগন্নাথ চক্রবর্তী
স্যুইস কবিতাগুচ্ছ

১. সব পথ আগলিয়ে আছে

সব পথ আগলিয়ে আছে পাহাড়
এই অভিভাবক পাহাড় আছে বলে
আকাশ ভেঙে পড়তে পারছে না নিচে
পাহাড়ের মধ্যে আছে প্রস্রবণ
আছে সব নদীর মূল শিকড়
যেমন তোমার মধ্যে আমার
আছে কুয়াশা এবং পানীয়
এবং সংশয় ও বিস্ময়
পাহাড় বড় কঠিন
সব পথ আগলিয়ে থাকে
এবং সব হ্রদ
যেমন এই আল্পস পর্বত
সব পথ আগলিয়ে আছে
সব সেতু এবং এরোড্রাম এবং

২. স্যুইস অপরাহ্নে

স্যুইস অপরাহ্নে সেদিন
হ্রদে ভাসতে ভাসতে
আমরা বিশ জন
একজন হিরোইনকে দেখছিলাম
নাকি বিশজন

বিশজন হিরোইনকেই দেখছিলাম
বিশজন একজনকেই দেখছিলাম
যদিও তা অসম্ভব
যদিও তাই অবশ্যম্ভাবী এবং

৩. কাঁকন অথবা রিস্টওয়চের ব্যাণ্ড

কাঁকন অথবা রিস্টওয়চের ব্যাণ্ড
এবং এক ঝোপ সোনালি রেশম
শিরোধার্য করে উঠে আসছে
স্যুইস তরুণী
হরিণী
সংগী হয়তো নেই
অথবা থাকলেও অনেক নিচে পড়ে আছে
যেমন সর্বদা থাকে
বুকে চূড়ামণিযোগ দর্পে
আল্পস পর্বতটাই চূর্ণচ্ছে
চূড়া থেকে আমি চূড়া দেখছি
অবশ্য যতক্ষণ উপরে আছি এবং

৪. হ্রদের মধ্যে

হ্রদের মধ্যে একটা বোট
এবং বোটের মধ্যে আমরা কয়েকজন
প্রত্যেকের পকেটে বেশ কিছু স্যুইস ফ্র্যা
আর চোখে বেশ কিছু কৌতূহল
জলের কিনারে অনেকগুলি রাজহাঁস

কিন্তু বোটের মধ্যে মাত্র একটি
সে আবার হংসিনী
ফ্রাউলাইন রুডি
জানি না কোন কুলের ঝি
তার মুখে শুধু একটিমাত্র ডাক
ডাংকে-ঝি ডাংকে-ঝি ডাংকে-ঝি এবং

৫. ক্রমশ তীক্ষ্ণ হয়

ক্রমশ তীক্ষ্ণ হয় স্মৃতি
ক্ষুরাগ্রে উঠে এসেছি একা
বিমুগ্ধ আততায়ী
যেন আত্মহত্যা উঠে এসেছে আকাশে
আল্পসের গা বেয়ে বেয়ে
এর নাম আল্পস
স্বয়ম্ভূ
যেমন আমরা
স্বয়ংসন্ধানী এই মুহূর্তে
আমি এবং পাহাড়-বাওয়া পিঁপড়ে
দুয়ের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই
আমি কোনো খাদ্য মুখে করে আনি নি
এই যা
সহোদরা কুয়াশা আমায় ঘিরে রেখেছে
এই নিরাপত্তাহীন ব্যূহে
কোথাও নিরাপত্তা নেই
একমাত্র এই পর্বত ছাড়া   এবং

৬. উপরে বৃষ্টি

উপরে বৃষ্টি
এবং নীচে যতদূর নিচে
বৃষ্টি
এরই নাম এরই নাম
আমার ওপর-কোটের ওপর
কুয়াশা যেন স্বপ্ন
এবং ভিতরে বুকের মধ্যেও তাই
এবং তার মধ্যেও
এরই নাম এরই নাম
হে ভূমধ্য পর্বত
এই নাও আমার অভ্রংলিহ অহং
চূর্ণ করো
আমার উপরে আশ্চর্য বৃষ্টি
এবং নীচে যতদূর দৃষ্টি যায়
অসম্ভব বৃষ্টি
হয়তো এরই নাম হয়তো বা নয়
সৃষ্টি এবং

৭. তুমি দাঁড়িয়ে আছো

তুমি দাঁড়িয়ে আছো তাই
নদী গড়াতে গড়াতে নামতে পারছে
সৃষ্টি হচ্ছে হ্রদ উপহ্রদ
এবং ছড়াতে পারছে
তুমি সব দূরত্বকে অনেক দূরে

হটিয়ে রেখেছো তাই
তারা নিজেদের দূরত্ব বজায় রাখতে পারছে
তোমাকে অনেক উঁচু হতে হয়েছে
এবং আমাকেও
যাতে কমলালেবুগুলি
বুকসই হতে পারে
আল্পস নামক তোমাকে
ইচ্ছে হয় সহোদর বলে ডাকি এবং

৮. পাহাড়ের উপরে বসে

পাহাড়ের উপরে বসে
প্রথমেই মাণিব্যাগটি বের করলাম
ঝনঝন করে ছড়িয়ে দিলাম
শিলার উপর
অনেকগুলি জলোচ্ছ্বাস ও মর্মর
গুপ্তযুগের মুদ্রা দামী
কিন্তু ভাঙানো যাবে না
এখানে এই আল্পসের উত্থিত উঠোনে
এগুলি বৃষ্টির জলে চুবিয়ে নিলাম
বৃষ্টির রিমঝিম টেইপে পুনর্জীবিত
অনেকগুলি কথোপকথন
পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে চলে গেল
আমি বাধা দিলাম না।
বাধা দিলাম না।

সুইট্জারল্যাণ্ড, ১৯৭৪

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

দিনলিপি ১৯৭৪

১. কে যে বুকের ভিতরে কে যে রেশমী সুতোয়
গেঁথে তোলে ফুল
জানি না কী নাম
বকুল বকুল !

২. হা-হা হাওয়ায় উড়ছে খড় কুটো
ছড়িয়ে দিলো কে যেন এক মুঠো
দুরন্ত বেগ কাজল-মাখা মেঘে
তাই কি আকাশ হঠাৎ উঠলো রেগে !

৩. শুধু বৃষ্টিই সারাদিন
হাতের মুঠোয় শুধু বেলা বহে যায়
শুধু বৃষ্টিই সারারাত
হাতের মুঠোয় শুধু নির্জন হাত !

৪. কে যে ভোরের রোদ্দুরে কী যে
আঁকি বুকি কাটে
ছুটে যায় মাঠে
সবুজে সবুজে
সাজেগোজে নিজে
মন আনমনা
খুশি খুশি দিন
এলো আশ্বিন ।

৫. বৃষ্টির মতো শুধু একা এবং একা
রোমাঞ্চ শব্দে নৈঃশব্দ্যে
পাতা কাঁপে শাখা কাঁপে
কেন ছুঁয়ে যাও প্রেমিক হে !

শান্তিকুমার ঘোষ

শেষ ফেরী

শেষ ফেরীতে আমাদের চ'লে-আসা নদীর উপর দিয়ে :
ছোপ ছোপ রঙ ধরিয়ে ফোলানো বেলুনের এক স্তূপ মেঘের ভিতর তখনো
রোশনাই······
আমার সঙ্গী নির্বোধ নয়—ডেকের কিনারে পা ঝুলিয়ে সে বসেছে দুহাতে
মুখ ঢেকে,
হাওয়ার সোহাগে তার ধূসর কেশপট উড়ে যায় আর কি ;
তোলপাড় জল পা-দুটো ডুবিয়ে ওঠা-নামা করে···
বেশ বুঝতে পারি, ঘুমে ভরপুর হয়ে আসছে তার দেহ···
উপরে নক্ষত্রমণি বা তারকা স্পষ্ট স্পষ্টতর হ'য়ে গেঁথে তোলে আকাশ-
পুরুষের বাঁকানো শিরস্ত্রাণ—
পরিস্রুত অন্ধকারে দেখা যায় না মুখ-রেখা···
নীচে উৎসবের সাজে দীপ্যমান জাহাজ ভেসে যায় দৃষ্টিপথ ছাড়িয়ে—
আমাকে নিদ্রাহীন রেখে...
কাছিয়ে-আসা তীরের বড়ো গাছ আর সিগ্‌ন্যাল পোস্ট ততক্ষণে
ডায়নোসরের আকার নিয়েছে···

ভাসাতে কি পারি

কেয়াঝাড় ঝাউবন টানা বালিয়াড়ি······
নৌ-নাবিক সমুদ্রের আমি
পারি হ'তে পারি।
হাঙরে কাটবে জাল—
ফেঁসে যাবে ভরা পাল,

বিনাশের মাঝে স্থির
ঘূর্ণীফস বিন্দু।
রোদ্দুরে চিকুর মেলে তোমরা কাটালে দিন
সৈকতে আলস্যময়—
একে অপরের শরীরে শরীরে ঢুঁড়ে
কতখানি পেলে ?
প্রমোদ-উদ্যান আর মন্দিরের চূড়াসুদ্ধ
তোমাদের মহাদেশ, ছাখো, মজ্জমান
প্লাবনের ঊর্ধ্বে শাস্ত ভাসাতে কি পারি আমি
বিজয়ী সাম্পান ॥

সুনীথ মজুমদার

স্নায়ুর অরুণিমা

১. আজ এই ভোরের আকাশ পরিচ্ছন্ন নীল কি না
সময় লাগে বুঝতে
নীলের ভেতরে নীল, নীল ধুয়ে দেয়
ঈশ্বরের যে নীলাভ বাসনা
তার ভেতর শুদ্ধতম চৈতন্যের নির্লিপ্তি
আলোকিত কিনা, আরো সময় লাগে এ-অনুভবে

২. আগুনের সামান্য একটু উত্তাপ দিয়েছ
তাতেই বুঝেছি
দহনে শুদ্ধ নির্লিপ্তি নিতে হবে
আগুনের দিকে প্রচণ্ড গতির্জাঢ্যে চলে যেতে হবে
চিনে নিতে হবে আগুনের রূপ
তারপর একদিন নিজেকেই নিয়ত দাহ্য হ'তে হবে
বিকীরিত হতে হবে

৩. কর্মে ঋদ্ধ হবো, নীরব হবো
বাসনাহীন এই বাসনা আমার
কর্তব্যের চাপে যেন
প্রতিদিন ধীরে-ধীরে ক্ষয়ে-ক্ষয়ে যায়

৪. মলয় পর্বত থেকে হাওয়া উঠুক
আমি চন্দন হবো
যেন সেই চন্দন বিলিয়ে যেতে পারি
চন্দনে চর্চিত হবে যারা

৫. রোগে ভোগে দারিদ্র্যে দুঃখে অপমানে ক্ষয়ে-ক্ষয়ে
নিজেরই ভেতরে
বিবেক ও বৈরাগ্যের যে-মন্দির গড়ে তুলি
সে-মন্দিরের দোরেও কেউ আসে না।
আমিও কাউকে ডাকি না আজ
একদিন বিগ্রহ স্থাপিত হ'লে
জানি আমি জানি
তারাই কিছুক্ষণ ব'সে যেতে বাধ্য হবে

৬. পাপ ধুয়ে-ধুয়ে নিষ্পাপ হবো।
অনুতাপ ও সমবেদনার অন্তর্দাহে
পুড়ে শুদ্ধ হবো।
নিজেকে দোহন ক'রে
প্রকৃতির কাছে ফিরে যেতে চাই

৭. গর্বটুকু কেড়ে নিয়ে ব্রত পূর্ণ করো।
ব্রতভ্রষ্ট হ'লে শাপ-তাপ নয়
উদাসী নিসর্গের জপমালা হাতে দিয়ে
কিছুক্ষণ ধ্যানে মগ্ন করো।

৮. 'সময়ের ভেতরে পুঁজ, পুঁজ ধুয়ে দিতে হবে'
যে কণ্ঠের চীৎকার
সেই কণ্ঠেরই স্বরনালী ক্ষতে ভ'রে আছে
সে ক্ষতের জন্য উপলব্ধি নেই
নিজস্ব আরোগ্যেরও কোনো উদ্যম নেই

৯. নিজেই পূর্ণ নয়, অপূর্ণকে কী ক'রে বলি পূর্ণ হও ?
নিজেরই ভেতরে নির্দেশ নেই, নিরুদ্দিষ্টকে
কীভাবে নির্দেশ দেব এই পথে যেয়ো ?
কে হুকুম তামিল করে ? কার হুকুমে ?
কেন তামিল করে ?
আমি যে-রকম নিজেকে গুটিয়ে এনে
উপলব্ধির দীর্ঘ প্রতীক্ষা করি
সে-রকম প্রতীক্ষায়
নিজেরই ভেতর থেকে একদিন
নির্দেশ পাওয়া যাবে

১০. জড়চেতনার চাবুকে যে আঘাতের তীব্রতা
সেতো জানি
সত্যের কোমলতা ; সেতো এই
জড়ের স্বরূপ চিনে নেবার দিকে যাওয়া
যতোক্ষণ না চিনি ততোক্ষণ আগলিয়ে থাকি
যদি চিনে নিতে পারি
তাকে মৃতদেহের মতো ছেড়ে দিয়ে
তার আত্মার সদ্গতি চেয়ে
তিলাঞ্জলি দেবো
শুক্তি থেকে দীর্ণ হ'য়ে মুক্তো হবো
তৃপ্ত হবো রূপান্তরে

শামস্থর রাহমানের কবিতা

বর্তমান যুগের হতাশা, ক্লান্তি, অবসাদ এবং সব অতিক্রম ক'রে আশার স্থর শামস্থর রাহমানের কবিতায় যেমনভাবে বেজেছে, উভয় বাংলার খুব কম কবির কাব্যকৃতিতে তেমনটি দেখা যায়। তাঁর কবিতা একাধারে ব্যষ্টি ও সমষ্টিপ্রেম, ফাঁপা সমাজ, সর্বসাধারণের দুঃখদুর্দশার ও চরম হতাশার মধ্যে পরম আশার এক প্রামাণিক দলিল। মানুষের হতাশা বেদনা আশা আকাঙ্ক্ষার নিখুঁত চিত্র তিনি যেমনটি এঁকেছেন, সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার ইতিহাসে তা এক আশ্চর্যস্থন্দর অভিজ্ঞতা বলে বিবেচিত হবে। প্রশ্ন হতে পারে, শামস্থরের সামনে বাংলা দেশের স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রাম ও ভাষা আন্দোলনের পটভূমি না থাকলে শামস্থর কি এত ভালো লিখতে পারতেন? উত্তরে বলা চলে, সার্থক কবিতা তো প্রত্যক্ষ বেদনাসঞ্জাত অভিজ্ঞতারই স্বর্ণফসল। ভাষা আন্দোলন না এলে শামস্থরের অবিস্মরণীয় লাইনগুলো "হে আমার আঁখিতারা......তোমাকে উপড়ে নিলে বলো তবে, কী থাকে আমার?" (বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা) সৃষ্টি হ'তনা। কিন্তু শুধু অভিজ্ঞতাই সব নয়, আপন প্রতিভার আশ্চর্য জারকরসে অভিজ্ঞতাকে জারিত ক'রে যিনি স্বাদু রচনা উপহার দিতে পারেন তিনিই সার্থক লেখক। শামস্থরের আছে সেই জাদু প্রতিভা। যখন অন্য কবিরা যান্ত্রিক সভ্যতার অবক্ষয়, বেদনা, দুঃখ ও আর্তিতে জর্জরিত, ঠিক তখনই তিনি প্রচণ্ড আশার ছবি এঁকেছেন। আর কোনো কারণে না হোক, অন্ততঃ এই একটি গুণের জন্য আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন। এ কথা বলছি না তিনি হতাশার ছবি আঁকেন নি। এঁকেছেন বৈকি। কিন্তু হতাশার পাশে পাশে "চোখ-অন্ধ-করা চৈতন্য ধাঁধাঁনো উজ্জ্বলতা"ও দেখেছেন। তিনি "জীবনেরই ডাকে বাহিরকে...ঘর, ঘরকে বাহির" করতে জানেন (ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯)। তাঁর কাছে "জীবন মানেই...ফসলের গুচ্ছ বুকে

নিবিড় জড়ানো,…মুখ থেকে কারখানার কালি মুছে বাড়ি ফেরা একা শিস দিয়ে…টেপির মায়ের জন্য…ডুরে শাড়ি কেনা…সহপাঠিনীর চুলে অন্তরঙ্গ আলো তরঙ্গের খেলা দেখা…অন্যায়ের প্রতিবাদে শূন্যে মুঠি তোলা…প্রিয়ার খোঁপায় ফুল গোঁজা…হাসপাতালের বেডে শুয়ে একা আরোগ্য ভাবনা…গলির মোড়ের কলে মুখ দিয়ে চুমুকে চুমুকে জলপান" (ঐ) এবং আরো অনেক কিছু। তাইতো দুর্মর দুর্জয় আশায় "এখনো…ফুল ফোটে বাস্তবের বিশাল চত্বরে হৃদয়ের হরিৎ উপত্যকায় সেই ফুল আমাদেরই প্রাণ" (ঐ) আর এই প্রাণের তাগিদে, আশার তাড়নায় কবি "চারদশকই বাঁচুন আর একদিন আরো বাঁচুন" শুধু লিখতে চান।

নিরাশা থেকে কবির আশায় উত্তরণ যে সহজসাধ্য হয় নি তা সহজেই অনুমেয়। এলিয়টের ভঙ্গিতে মানুষের বহুযত্নে গড়া আদর্শ প্রতিমাগুলোকে কবির মনে হয়েছে "a heap of broken images" এই সমাজের মানুষ "Shape without form, shade without colour, paralysed force, gesture without motion." "যিনি নম্বর ভালবাসতেন" তিনি মনে করছেন জীবন নোটের নম্বরে ছাওয়া, তাই টাকা ছড়িয়ে হাতের মুঠোয় সব কিছু পেলেও ("লো-কাট ব্লাউজ; পলিসি নম্বর ব্রিফকেস, চেকবই প্রসন্ন নোটের তাড়া" সবই ছিল তাঁর) আসলে তিনি ফাঁপা মানুষেরই মূর্ত প্রতীকতারই পরিণতি, বাগানের স্তব্ধতায় পতনের শব্দ আর নিঃশব্দ ভীষণ বুকের একান্ত ঘড়ি, শূন্য হাত। "ফাঁপা সমাজের'' তিনজন বুড়োর প্রথম জন "খুঁটিনাটি ফ্যাসাদ মিটিয়ে…জুতোর পাটির চেয়ে ঘন ঘন" বউ বদলেছেন। ইনি প্রুফ্রকের কায়দায় না হলেও অন্যভাবে "have measured out…life with coffee spoons." দ্বিতীয় জন গণঅভ্যুত্থানের গতিপ্রকৃতি দেখে কৌতুক বোধ করেছেন। এঁরা ফাঁপা সমাজের মানুষ, তাই নিজের গল্প বলতে আগ্রহী হন, অন্যের

কার্য পদ্ধতিতে মূর্খামির পরিচয় পেয়ে কৌতুকান্বিত হন, দেওয়ালের লিখন ফাঁপা মানুষরা পড়বে কি করে? শামসুর এখানেই থামেন নি, এলিয়টের ফাঁপা মানুষদের পোড়ো জমি ছাড়িয়ে নতুন বসতির দিকে এগিয়েছেন তৃতীয় বৃদ্ধের মাধ্যমে উপনিষদের দ্বিতীয় পাখির মত, যে "দেখে শুধু দেখে গভীর একাকী।" আশার জোলো কথা উচ্চারণ না ক'রে কবি যে নিখুঁত আশার ছবি এঁকেছেন তা অবাক বিস্ময়ে দেখবার মত। এই ধরণের আশাবাদ অমিয় চক্রবর্তীর কবিতাতেও পাওয়া যায়, কিন্তু সে আশা বেশ কিছুটা রাবীন্দ্রিক ও এলিয়টীয় ভাবনায় ঈশ্বরনির্ভর ("ঝোড়ো হাওয়া আর পোড়ো বাড়িটার ঐ ভাঙ্গা দরজাটা মেলাবেন তিনি মেলাবেন")। শামসুরের আশাবাদ গণদেবতা-নির্ভর। এই গণদেবতা "সংখ্যাহীন।" তাঁর আশারূপী "লোক" সর্বত্র, "আমাদের চোখের পাতায় লোক।...পাঁজরের সিঁড়িতে লোক।...ধুকধুকে বুকের স্কোয়ারে লোক" (পুলিশ রিপোর্ট)। যখন "প্রেমিক শয্যায় তার কাতর মৃত্যুর প্রতীক্ষা" রত, তখন "প্রেমিকা তার (ফাঁপা মানুষদের একজন) রেস্তরাঁয় তিনটি যুবার সাথে রাষ্ট্র করে হৃদয়ের গল্প"। এই সমাজেরই লোকেরা "শক্তির দোহাই পেড়ে সবাই সটকে দিচ্ছে পায়রার ঘাড় এবং প্রগতিশীল নাটকের কুশীলবের কমতি নেই, পার্ট জানা থাক অথবা না থাক সমস্বরে চেঁচালেই কেল্লা ফতে" (আকাশের পেটে বোমা মারলেও)। আধুনিক সভ্যতা দিয়েছে দারিদ্র্য দুঃখ বঞ্চনা অভিশাপ। তারই ফলশ্রুতিস্বরূপ তাঁর প্রিয় শহর "নগ্ন হাটে খোঁড়ায় ভীষণ; রেস খেলে, তাড়ি গেলে হাঁড়ি হাঁড়ি......ছায়ার গহ্বরে আত্মার উকুন বাছে... রাত্রি এলে সাত তাড়াতাড়ি যায় বেশ্যালয়...সিফিলিসে ভোগে...বুকে হাতে ঝোলায় তাবিজ তাগা, রাত্রিদিন করে রক্তবমি" (এ শহর) এখানে কবি এলিয়ট কথিত "shape without form" সমাজকে মেনে নিয়েছেন। যেটা আধুনিক সভ্যতার দান, তাকে মেনে নেয়াই তো বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু হতাশায় তিনি কখনো ভেঙে পড়েন নি, তাই

"সবুজ উদ্দাম বসন্ত" (সমর সেন) আসবে কিনা সে সম্পর্কেও তাঁর কোন দ্বিধা নেই ("এ শহর...এলগ্রেকো ছবি হয়ে ছোঁয়া যেন উদার নীলিমা" (ঐ) এ শহর মৃত্যুঞ্জয়ী, কেন না "এ শহর প্রত্যহ লড়াই করে বহুরূপী নেকড়ের সাথে" (ঐ)। শামস্থর "hooded hordes swarming over endless plains" দেখে ভয় পান নি, তাদের সঙ্গে লড়াই করতে প্রতিমুহূর্তেই প্রস্তুত। সেই সংগ্রামের প্রস্তুতি হিসেবে কবি দেখেন "চতুর্দিকে তরঙ্গিত মাথা / উত্তাল উদ্দাম" (পুলিশ রিপোর্ট)। এই কারণেই বলা যায় শামস্থর নিরাশার মধ্যেও আশার কথা নতুন করে বলিষ্ঠতার সঙ্গে দৃপ্তকণ্ঠে বার বার শুনিয়েছেন।

শামস্থরের হৃদয় যন্ত্রণাজর্জর। তাই হতাশা ছাপিয়ে আশার কবিতা তিনি সবসময় শোনাতে পারেন নি, এ কথা সত্য। মৃত্যুভয়ও তাকে ঘিরে ধরেছে কখনো কখনো। "যেন মৃত্যু অকস্মাৎ এ শহরে সব কটি ঘরে দিয়েছে বাড়িয়ে হাত", তাই শত ডাকা সত্ত্বেও "দেয় না উত্তর কেউ" (ডাকছি)। স্থপ্রাচীন গ্রীকের মত "এ্যাম্ফিথিয়েটার থেকে"...পালা দেখে "ফিরে যেতে যেতে" "কে যেন ডাকছে" (ফিরে যাচ্ছি) মনে হলেও "এ আমার মতিভ্রম, কেউ ডাকছে না।" কিন্তু তা কি হয়? কেউ ডাকবে না?" প্রশ্নমনস্ক কবি উত্তর না পেয়ে কি তাই একাকীত্বে আশ্রয় পেতে চান? এই কারণেই কি তিনি "পুনরায় রৌদ্রহীন রৌদ্রে...পথহীন পথে?" (প্রত্যাবর্তন) তাহলে কেমন ক'রে তিনি "বুকের একান্ত রৌদ্রে ...হু হু জনহীনতায়" (টিকিট) স্বাধীনতার টিকিটকে লালন করতে চান? আসলে বন্ধুদের বিশ্বাসঘাতকতায় যন্ত্রণাজর্জর হয়ে ("ঘাসের নিচের সেই বিষাক্ত সাপকে ভালবাসি, কেননা সে কপট বন্ধুর চেয়ে ক্রূর নয় বেশী রাগী বৃশ্চিকের দংশন আমার প্রিয় কেননা সে দংশনের জ্বালা অবিশ্বাসিনী প্রিয়ার লালচুম্বনের চেয়ে অনেক মধুর" (পক্ষপাত) কবি একাকীত্ব খোঁজেন, "কোকিল কুকুর হাঁস টিকটিকি"র সঙ্গ পেতে চান (প্রকার-ভেদ)। আর তখনই জীবনানন্দীয় "স্বপ্নের হাঁস আসে নেমে" (ছেলেটা

পাগল নাকি ?) যদিও তা ক্ষণিকের জন্য। কবি বুঝতে পারেন যে তাঁর নিষ্ক্রিয়তা ও নীরবতার সুযোগ নিয়ে কারা যেন বাক্‌স্বাধীনতা কেড়ে নিচ্ছে; অমনি বিদ্রোহী কবি সত্তা "গাছের পাতা, আকাশের নক্ষত্র নদীর ঢেউ, প্রতিটি ফুল, চোখের মণি, হাত, গাছ" "সবাইকে বাক্‌স্বাধীনতা দিতে" ব্যগ্র হয়ে ওঠে। তাইতো গণ-সংগ্রামে শামিল হবার ডাক এলে প্রিয়ার 'সলজ্জ সান্নিধ্যে' যাবার মন থাকে না; কেননা আমাদের বুকে জ্বলে টকটকে ক্ষত / অনেক নিহত আর বিষম আহত / অনেকেরই প্রেমালাপ সাজে না" (প্রতিশ্রুতি)। কবি "আজন্ম······যুদ্ধকে···ঘৃণা" করেন কেননা যুদ্ধ "মূল্যবোধ নামক বৃক্ষের প্রাচীন শিকড় ছিঁড়ে" ফেলে "চতুর্দিকে" ধ্বংসের "বাজায় দুন্দুভি"। "তবু যখন নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে ওঠে তখন "যন্ত্রণাজর্জর······বাণীহীন বিমর্ষ কবি" থেকে শুরু করে "সৈনিক ধর্ষিতা তরুণী" এমনকি "শান্তিপ্রিয় ভদ্রজন"ও বলবেন "যুদ্ধই উদ্ধার"। তাইত স্বাধীনতা-প্রাপ্তির উদ্দামতায় উন্মত্ত হয়ে "পাইকারী হত্যা···রমণীদলন আর ক্লান্তিহীন রক্তাক্ত দস্যুতা"কে চিরতরে মুছে দিতে ইস্পাতদৃঢ় শপথে কবিকণ্ঠে দৃপ্ত তেজে ঘোষণা করে :

> সুরম্য প্রাসাদের সব স্তম্ভ ফেলবো উপড়ে······
> ···সুনিশ্চিত করবো লোপাট সৈন্য আর দাসদাসী অধ্যুষিত এই রাজ্যপাট।
>
> (স্বামসন)

শামসুরের কাছে জীবনের এক বিশেষ অর্থ আছে। তিনি জানেন সমাজের চারদিকে শাসনের চোখ উঁকি ঝুঁকি মারে, গুপ্তচর বৃত্তিতে দেশ ছেয়ে গেছে। শত্রুপক্ষ একটুখানি আদর ভালবাসার সুযোগও দেবে না ("আমার চুমোর ওপর / পড়ে দুর্ভিক্ষের ছায়া"-কী যুগে আমরা করি বাস)। অথচ বাঁচতেই হবে তাই নিজে অক্ষম হলেও "কর্মিষ্ঠ নকীব" পাগল ছেলেটার দিকে আশার হাত বাড়ান, তারই চোখে কবি "কালের গতি, মার্কস আর লেনিনের প্রসিদ্ধ পাতায়" লক্ষ্য করতে থাকেন (ছেলেটা পাগল নাকি ?)। নাস্তিক কবিসত্তা ঈশ্বরকে ব্যঙ্গ করে সাম্রাজ্যবাদের

মুখোস তুলে ধরেন—

সকল প্রশংসা তাঁর করুণা অপার
বুঝি তাই যুগে যুগে সোৎসাহে পাঠান
বিশ্বে জনসন আর সালাজার (সকল প্রশংসা করে)

সমাজ বিমুখ স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিদের প্রতি তাঁর শ্লেষ সত্যই মর্মভেদী—

মেষ রে মেষ, তুই আছিস বেশ
…খড়বিচুলি পেলেই পোয়া বারো
জাবর কেটে দিন চলে যায় পশম বাড়ুক আরো (মেষতন্ত্র)

রাজতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্রের মুখোস খুলে ধরতে বুঝি তার দোসর পাওয়া ভার—"ধন্য রাজা ধন্য দেশ জোড়া তার সৈন্য / কেবল পোড়া মুখে পোরার জুমুটো নেই অন্ন / শোনো সবাই হুকুম নামা / ধরতে হবে রাজার ধীমা। বাঁ দিকে ভাই চলতে মানা / সাজতে হবে বোবা কানা। মস্ত রাজা হেলে দুলে / যখন তখন চড়ান শূলে / মুখটি খোলার জন্য ধন্য রাজা ধন্য" (রাজকাহিনী)।

কবি নাস্তিক হলেও সত্য সৌন্দর্য প্রেমের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন না। প্রেমের প্রতি তাঁর অটুট আস্থা "কেননা শিখিনি ঘৃণা বস্তুতঃ ঘৃণায় নয় জানি / প্রেমেই মানুষ বাঁচে (ঘৃণায় নয়)"। এই প্রেমই (ব্যক্তিপ্রেম ও দেশপ্রেম) কবিকে দেখিয়ে দেয় কি ক'রে গাঁয়ের জননী ও "সন্তানের রক্ত মাখা জামার আহ্বানে…পুত্রহীন হৃদয়ের দীপ্ত কান্না শ্লোগানে, শ্লোগানে" গলা মিলিয়ে মিছিলে শামিল হন (মা)। এই প্রেমই কবিকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করে সেই "হাত"কে যে হাত অন্তরঙ্গতায় / মোহন সুনীল হয়"; কবি চকিত বিস্ময়ে দেখেন সেই হাতকে বাঁশি ডাকে / ডাকে সাত রঙ, / শোনে সে আহ্বান পাথরের! সে হাতের মৃত্যুভয় নেই (হাত)। তাইতো "ভীষণ বুড়িয়ে" যাওয়া সত্ত্বেও "বেলা অবেলায় নিজেদের বেশ জবুথবু" মনে হতেই সেই বালকই

কবি-সত্তার কাম্য হয় যার খোলা চোখে···রাজসিক···ছলনা” ধরা পড়ে এক নিমেষেই (ঐ)। সে এলেই তাকে “বসিয়ে বিকল্প ঘরে হরিদ্রাভ বয়সের দিকে” কবি যাত্রা করবেন। এযুগে বাস করে tension কে এড়ানো যায় না। তাই স্বাভাবিক ভাবেই শামস্থরে tension আছে। কিন্তু সেই tension এর মধ্যেই তিনি প্রচণ্ড আশাবাদী। তাই তিনি যেমন “পিতার শব···সর্বদা” বয়ে বেড়াতে রাজি নন ঠিক তেমনই সময় হলে “হরিদ্রাভ বয়সের দিকে” এগুতে চান, আগন্তুকের জন্য ঘর ছেড়ে দিতে চান। এর মধ্যে এতটুকু বেদনাবোধ নেই তাঁর। সারা জীবন ধরে tension এর মধ্যে থেকে হরিদ্রাভ বয়সে tensionless হওয়াটা কম কথা নয়। Tension থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা তাঁর কাব্যজীবনের প্রথম দিকেই লক্ষ্যণীয়। “শিখা” “নির্জনদুর্গের গাথা” “কোনো পরিচিতাকে” ইত্যাদি কবিতায় সব-ব্যথা-ভুলিয়ে-দেয় এমন প্রেমের সন্ধান পাওয়ার কথা স্বীকার করেছেন কবি। অর্থাৎ tension-বিহীন হওয়ার অভিজ্ঞতা আজীবনই আছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কবির আশাবাদ যে ক্ষণিক মোহ-মুক্তির চিত্র নয়। কবির মানসিকতা যে প্রচণ্ড ভাবে স্বর্ণময় ভবিষ্যতের ইংগিতবাহী এ কথা নিদ্বিধায় বলা চলে।

প্রত্যেক বিশিষ্ট কবিরই একটি প্রিয় রং থাকে। জীবনানন্দ, সমর সেন ইত্যাদির প্রিয় রং ধূসর, অমিয় চক্রবর্তীর গৈরিক। শামস্থরের প্রিয় রং শাদা। অবশ্য ধূসর তাঁর জীবনে ও কাব্যকৃতিতে বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে, তবু শাদা তাঁর আসল রঙ। উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। “শাদা শার্ট” (এক পাল জেব্রা), “রূপালি মাছ” (হাত), “শুভ্র দাঁত” (দাঁত), “রূপালি শহর” (দুঃস্বপ্নে একদিন)। “বৃষ্টির ধবল দাঁত” (হাত), “শ্বেত কাগজের শব্দমালা” (বিকল্প ঘর)। “দুধসাদা স্বপ্নের অচেনা গলি পথে” (রৌদ্রে নিয়ে যাও) “মগজকে তুলে ধরি কাঁচা দুধেল জ্যোৎস্নায়” (পার্ক থেকে যাওয়া যায়) “শান্তির:·····পায়রা” (আকাশের পেটে বোমা মারলেও) ইত্যাদি তাঁর সাদা-প্রিয়তারই নির্ভুল

সাক্ষ্য বহন করচে। শাদা রং সেই উজ্জ্বলতারই প্রতীক যে "চোখ-অন্ধ-করা / চৈতন্য ধাঁধানো / উজ্জ্বলতা দেখেননি মূসাও কখনো" (পুলিশ রিপোর্ট)। যুগের প্রতীক ধূসর রং তাঁকে স্পর্শ করলেও তিনি আরো এগিয়ে হৃদয়ের শুভ্রতাকেই খুঁজতে চেয়েছেন। কবি প্রথমজীবনের কাব্য সাধনায় নারীর খোলা চুলে ও বাহুতে আবদ্ধ হতে পরিতৃপ্ত হতে চাইতেন, তখন তাঁর রং ছিল ধূসর। তখন তিনি খণ্ডিত বেদনাময় প্রেমে পরিতৃপ্তি খুঁজতেন (ধূসর শূন্যতা ও বেদনার প্রতীক)। ধীরে ধীরে বাংলাদেশের স্বাধিকার অর্জনে লিপ্ত হয়ে কবি তাঁর হারানো ব্যক্তিপ্রেমকে মদনভস্মের মতো বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়ে পেলেন নূতনতর প্রেমের সন্ধান যার মূল সুর আশা, যার রং নির্ভুলভাবে শাদা। শাদা এমন একটি রং যাতে কোনো মালিন্য নেই, মলিনতা স্পর্শ করলেই শাদা ভীষণ নোংরা হয়ে যায়। এই শাদা রং কবির উষর জীবনে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

সুররিয়ালিস্ট কাব্য আন্দোলনের প্রভাব শামসুরের কবিতাতেও লক্ষ্য করা যায়। "একপাল জেব্রা" (তুলনীয় জীবনানন্দের "হরিণের" ও "ঘোড়া") দুর্দমনীয় যৌবশক্তির প্রতীক। অত্যাচারীর অত্যাচার অনাচার সহ্য করতে না পেরে মাঝে মাঝে তারা "তুমুল উদ্দামতায় মেতে ওঠে।" "ওরা ঘুরে মুণিমুক্তো" রূপী বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ "ছড়িয়ে ছুটে যায়, ফিরে আসে না আর।" কবির কবিতায় বিদ্রোহাগ্নির স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়ে অবদমিত যৌন বাসনারূপী একপাল জেব্রা অবচেতন স্তরে মিলিয়ে যায় আর চেতনার স্তরে ভেসে ওঠে না। তখন ক্ষোভে কবির "নিজেরই হাত কামড়ে ধরতে ইচ্ছে হয়।" "সবুজ ফ্ল্যাগ / ওড়াতে ওড়াতে একটি কবিতার শাঁ শাঁ ট্রেনকে / অন্তিম স্টেশনে পৌঁছে দিতে না দিতেই" (অর্থাৎ আত্মকেন্দ্রিক সবুজ প্রেমের কবিতা লেখা শেষ না হতেই) "আবার একপাল জেব্রা / তুমুল ছুটোছুটি করে বাতাস চিরে রৌদ্র ফুঁড়ে আমার বুকের আফ্রিকায়"। অর্থাৎ জেব্রারূপী যৌন বিপ্লবী চেতনা বারবার চেতনার (প্রান্তর এখানে চেতনার প্রতীক) দরজায় ঘা দেয়

জেগে উঠবার জন্য, অত্যাচার-অবিচারকে নির্মূল করার জন্য। "বর্ণ নিয়ে" "পুরোটাই দৈবাৎ ঘটনা" বৈকি। [স্যুররিয়ালিস্ট ভাবধারা আকস্মিক ঘটনার (যা প্রায়ই কাল্পনিক) উপর ভিত্তি করেই তো রচিত হয়েছে।] শৈশবে-পড়া 'অ' কারের সেই অজগর হঠাৎ তেড়ে ফুঁড়ে এল। তার পর এলো 'আ' কার ফুল বাবুটির মতো। তারপর ভীষণ কা-কা শব্দ করে এল 'ক'। এরপর এল 'ল' 'ক্ষুধার্ত চোখ' 'ভিক্ষার পাত্র' আর 'ছায়ার মিছিল' নিয়ে। শৈশবের বিদ্রোহী ও জেদী আজগরিক ভঙ্গী কবির চেতনার স্তরে ভেসে উঠে পুনরায় মগ্নচৈতন্যে লীন হল। যৌবনে কবির মন সবুজ প্রেমের বিলাসে ফুলবাবু হয়ে আজগরিক ভঙ্গী গেল ভুলে। সেই ফুলবাবুত্বের লালিমা মুছে গেল 'ক' অক্ষরের কা কা শব্দের রূঢ়তায় অর্থাৎ দুঃখ দারিদ্র্য হতাশা ভরা গন্ধময় বাস্তব জীবনে এসে হাজির হল। তাই ফুলবাবুত্বের প্রশ্রয়ে আগেকার স্বপ্ন রঙীন আত্মকেন্দ্রিক কবিতা লেখা সম্ভব নয়। ক্ষুধা-ভিক্ষা মিছিল-কেন্দ্রিক-কবিতা বিদ্রোহের রূপ নিয়ে অবচেতন মন থেকে কখনো সখনো চেতনার স্তরে উঁকি ঝুঁকি মারে। "তার আগে" কবিতায় চেতনার স্তরে আকাশ গাছপালা, গলির মোড়, আত্মীয়ের মৃত মুখ, মেথরাণীর নিতম্ব ইত্যাদি খেলা করে। অবচেতন স্তর থেকে অবদমিত যৌনশক্তি ভেসে ওঠে চেতনার স্তরে। বিপ্লবের পাখি অবচেতন মনকে ঠুকরে খায়, ঝাঁক ঝাঁক লাল পিপড়ে রূপী বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গে সমস্ত মন অস্থির হ'য়ে ওঠে। দ্রুতগতি ট্রেন যেমন অকস্মাৎ মধ্যরাত্রে ঘুম ভাঙিয়ে চমকে দিয়ে চলে যায়, তেমনই এই সব অবদমিত বাসনা কামনার আবির্ভাব এরা হঠাৎ আসে হঠাৎ ডুব মারে। অবশ্য স্যুররিয়ালিস্ট কবিতায় চেতন স্তরকে অবচেতন স্তর ছাপিয়ে উঠতে হয়। শামসুরের কবিতায় চেতন স্তর সর্বদাই সক্রিয়, তাই আদর্শ স্যুররিয়ালিস্টিক কবিতা রচনা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি।

এবার শামসুরের কবিতার চিত্রধর্মিতার কথা। এককথায় শামসুরের কবিতা ইম্প্রেশনিস্টরের আঁকা চিত্রের ইংগিতবাহী। ইম্প্রেশনিস্টদের

কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল : যে দৃশ্য আঁকা হচ্ছে, তা যেন এক ঝলক দেখে নিয়ে যেমনটি দেখেছেন তেমনটি তাঁরা বসাতে চান। তাই এই ছবিগুলির খণ্ডাংশের কোনো অর্থ হয় না। সব মিলিয়ে একটা total effect সৃষ্টি করাই এঁদের উদ্দেশ্য। শামসুরের কবিতার খণ্ডাংশের অর্থ হয় না। তাঁর কাব্যের সামগ্রিক আবেদনই বড় কথা। তবে ইমপ্রেশনিস্টদের ছবির কাছ থেকে কিছুই বোঝা যায় না, দূরে গেলে তার আদ্যন্ত রূপটি ধরা পড়ে। এদিক দিয়ে শামসুর ইমপ্রেশনিস্টদের সমগোত্রীয় নন, কেননা তাঁর কবিতা প্রায় ক্ষেত্রেই বুঝতে দূরে যেতে হয় না বা বেশি ভাবতে হয় না। ইমপ্রেশনিস্টদের মত কবির সৃষ্টির পটভূমি খোলা আকাশ, প্রান্তর। যে প্রকৃতি প্রতি মুহূর্তেই বদলাচ্ছে। কবি কত তাড়াতাড়ি তাদের রূপটি ধরেছেন ইমপ্রেশনিস্টদের দ্রুত সোজা টানের মত। ভাষার প্রকরণের সূক্ষ্ম কৌশলের দিকে দৃষ্টি না রেখেই। ইমপ্রেশনিস্টরা সাধারণ বলে কোন বস্তুকেই অবহেলা করেন না। শামসুরও সামান্যতম বস্তুকে আদর করে কাব্যে স্থান দিয়েছেন। জুতো, বেঞ্চি, পার্ক, জাল, টাক্সি, টিকিট পুঁই শাক, পা-পোষ, কই, মহিষ ইত্যাদি শব্দ নির্দ্বিধায় তাঁর কাব্যে স্থান পেয়েছে। আঙ্গিকে ধ্রুপদী শিল্পীদের সুস্পষ্ট ও সুশৃংখল শৈলীকে ইমপ্রেশনিস্টরা অনুসরণ করেন না। শামসুর প্রথাগত ছন্দবন্ধ মানেন নি, অতি আধুনিক চলিত শব্দকে দুম করে তৎসম শব্দের পাশে বসিয়েছেন এবং আশ্চর্য তা, মোটেই বেমানান শোনায় নি।

জীবনানন্দের কবিতায় নারীদেহ বর্ণনায় রতিভাব উদ্রেককারী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উল্লেখ নেই। নারীকে ঘিরে আদিম আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতার বাসনা তাঁর কবিতায় নেই। বড়জোর তিনি অশ্বকারের স্তন ও যোনি থেকে ঘাসমাতার স্তন ও যোনি বা শূকরীর যোনি পর্যন্ত অগ্রসর হন কিন্তু মানবীর ক্ষেত্রে কখনও নয়। জীবনানন্দ নারী ও প্রকৃতির বেড়া ভেঙে চেতনাকে প্রসারিত করেছেন। জীবনকে প্রকৃতির মধ্যে প্রসারিত করে, প্রেমের সূক্ষ্ম অনুভূতির মধ্যে ব্যাপ্ত করে মানব সভ্যতার আবহমান

ইতিহাস চেতনার পটভূমিকায় বিস্তৃত করে সর্বাঙ্গীন উপলব্ধির চেষ্টা করেছেন। তাই তাঁর কাছে জীবন সংকীর্ণ নয়। ব্যাপক ও গভীর। শামসুর জীবনকে বিরাট বিস্তৃতি দিলেও প্রকৃতিপ্রেম ও জীবনের ত্রিবেণী-সঙ্গম ঘটাতে পারেন নি। জীবনানন্দীয় ভংগিতে প্রেমকে প্রকৃতির ভিতর নিতে চাইলেও, নারীকে ঘিরে আদিম আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতার বাসনা মনে মাঝে মাঝে উঁকি দিয়েছে। "মেথরাণীর নিতম্ব" (তার আগে) নিয়ে তাঁর কবিতা লিখতে সাধ জাগে। "ক্লান্ত বারবনিতার সঙ্গে সঙ্গমের" (কোনো কোনো কবিতার শিরোনাম) উল্লেখ যৌনতা বোধের পরিচায়ক। শব্দের হাত থেকে পিছলে যাওয়ার উপমা খুঁজেছেন "মুঠো থেকে স্তন" পিছলে যাওয়ার দৃশ্যে (ঐ) উপমাটি সুন্দর হলেও প্রত্যক্ষ যৌনাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতার রেশ টেনে আনে। কবিতার / খাতা নগ্ন নারীর মতোই চিং হয়ে / উদর দেখিয়ে / টেবিলে থাকবে শুয়ে তার দেয়ালের টিকটিকি / প্রকাশ্যেই করবে সঙ্গম" (বিবেচনা) সম্পর্কেও একই কথা। তবে যে সব স্থানে নারীদেহ এবং প্রকৃতির বেড়া ভেঙে চেতনাকে প্রসারিত করতে পেরেছেন সেখানে তিনি সত্যই সার্থক। যেমন বিপুল শুভ্রতার / স্তন্য পান করে শব্দ বেড়ে ওঠে লীলায়িত স্বাস্থ্যে (বিকল্প ঘর), "হবে সে সূর্যের সেবাদাসী" (রৌদ্রে নিয়ে যাও) "আমার যে-ঘর নেই। সে-ঘর আমাকে ডাকে বুক হাট করে / আমার যে প্রিয়া নেই / ডাকে সে বুকের পদ্ম উন্মোচন করে" (প্রত্যাবর্তন, স্মরণীয় সুধীন্দ্রনাথের বক্ষের যুগল স্বর্গ), "এ শহর......রাত্রি এলে শরীরকে উৎসব করার / বাসনায় জ্বলে সাত তাড়াতাড়ি যায় বেশ্যালয়ে" (এ শহর) "আমার ওষ্ঠ তার ওষ্ঠের গাঢ় বন্দরে ভিড়তে অধীর" (কতোবার ভাবি) "রাজপথ নিদাঘের বেশ্যালয়" (হরতাল ইত্যাদি)।

শামসুরের এ্যালিউশান সত্যই সুন্দর! হিন্দু মুসলিম ও গ্রীক পুরাণ থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি আছে তাঁর কাব্যে। নাচিকেত চৈতন্য, অতনু স্মৃতি, কুশীলব, বুররাখ, ফেরেস্তা, মোহাম্মদ, মুসা, স্যামসন ইত্যাদির প্রয়োগ

অত্যন্ত সুন্দর। আধুনিক যুগের বিশিষ্ট প্রতিভার নাম তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গেই উচ্চারণ করেছেন। এলগ্রেকো, র‍্যদা, কাণ্ডিনস্কি, পিকাসো, মাতিস, রাসেল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে সকলেই বিশেষ সম্মানের স্থান পেয়েছেন। তাঁর চিত্রকল্প ও উপমা সত্যই অনবদ্য। যথা "গলিত কাঁচের মতো জল" (বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা)। "রাজপথ নিদাঘের বেশ্যালয়" (হরতাল)। স্তব্ধতা সঙ্গীন হয়ে বুকে / গেঁথে যায়" (ঐ) "ক্লান্তির কফিন ঢাকা শরীর" (ধানী) সৌরভের মদে চুর (কোনো কোনো কবিতার শিরোনাম) "করি পান আকণ্ঠ আরক শ্রাবণের" (পার্ক থেকে যাওয়া যায়) "বিপুল স্তব্ধতার / স্তন্য পান করে শব্দ বেড়ে ওঠে লীলায়িত স্বাস্থ্য" (বিকল্প ঘর) "একদা কবিতা তার স্তনের গোলাপ কুঁড়ি চেয়েছিল দিতে (কাজী নজরুল ইসলামের প্রতি) "লুকানো গুহার দিকে যাত্রাকালে মোহম্মদ যে স্তব্ধতা আস্তিনের ভাঁজ / একদা নিয়েছিলেন ভরে" (হরতাল) "চোখ-অন্ধ-করা / চৈতন্য ধাঁধানো / উজ্জ্বলতা দেখেন নি মুসাও কখনো" (পুলিশ রিপোর্ট) ইত্যাদি। কিছু বাক্য তো প্রবাদ প্রবচনে পরিণত হবার দাবী নিয়ে এসেছে।

"Every revolution in poetry is apt to be, and sometimes to announce itself as return to common speech" (The Music of Poetry : T. S. Eliot)। এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যাবে আধুনিক কবিতায় চলিত ভাষার গুরুত্ব কতখানি। শামসুর কবিতায় চলিত ভাষা যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করেছেন এবং প্রায় ক্ষেত্রেই তিনি সার্থক হয়েছেন। গদ্যাত্মক ভঙ্গিতে তাঁর কবিতা লেখার রীতি সুধীন্দ্রনাথের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁর চলিত ভাষার অপরূপ নমুনা, "কাগজের ঝাঁক যেন একতাড়া নোট ফুরফুরে" (যিনি নম্বর ভালবাসতেন)। "ভীষণ বুড়িয়ে গেছি……জবুথবু লাগে" (একটি বালকের জন্য প্রার্থনা) "প্রকৃতির / খোলামেলা দরবারে আয়ুর মেয়াদ বাড়ানোর ব্যাকুল তদ্বির নিয়ে যাই" (উদ্ধৃতিটি সুধীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গদ্যভঙ্গির কথা

মনে করিয়ে দেয়)। "ইনি কবি মনে / করেন শব্দের ধনে প্রচুর পোদ্দারি" (কোনো কোনো কবিতার শিরোনাম)। "ট্রাউজারে কানে দখিন হাওয়ার গুলতানি পুরে, পাখিদের গান / শার্টের আস্তিনে গুঁজে" (পার্ক থেকে যাওয়া যায়) "ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশে যাচ্ছি" (দুঃস্বপ্নে একদিন)। "মালিশের ঝাঁ ঝাঁ গন্ধ এলো ভেসে···উজিয়ে অনেক ঘর" (মাতামহর মৃত্যু) ইত্যাদি। ছন্দে নানা ভেলকি দেখিয়েছেন তিনি। কোন যৌগিক শব্দকে ভেঙে অর্ধেক আগের লাইনের শেষে, অর্ধেক পরের লাইনের শুরুতে ব্যবহার করে অভূতপূর্ব বৈচিত্র্য এনেছেন। একই কবিতায় নানা ছন্দের বিচিত্র প্রয়োগ তো আছেই। গুরুগম্ভীর চাল বোঝাতে দীর্ঘ বাক্য সম্বলিত ছন্দ (মা) দ্রুতগতি বোঝানোর জন্য কাটা কাটা ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার করেছেন। আবার দ্রুতগতির অতিরিক্ত গুরুত্ব বোঝানোর জন্য ছোট ছোট বাক্যের আগে ও পরে বিলম্বিত ছন্দ ব্যবহার করেছেন (বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা)। অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত, মহাপয়ার সমস্ত ছন্দেই তার অসামান্য দখল।

আধুনিক কবিদের কবিতায় কিছু কিছু প্রতীকের ব্যবহার দেখা যায়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের বেনামী বন্দর, জাহাজের ডাক, বুদ্ধদেব বসুর মায়াবী টেবিল, জীবনানন্দের পেঁচা, হরিণ, বুনোহাঁস, সুধীন্দ্রনাথের উটপাখি, অমিয় চক্রবর্তীর চেতন স্যাকরা, গাছ, মন্দির, এরোপ্লেন, বিষ্ণু দের পলিমাটি, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নিশান, মিছিল, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মানুষ, অরুণ ভট্টাচার্যের বাতাস, শামসুরের নকীব ইত্যাদি এই সব প্রতীকের অন্তর্ভুক্ত। ফ্রয়েডীয় ভঙ্গিতে কবিরা মগ্নচৈতন্য থেকের প্রতীক আহরণ করে থাকেন। জীবনানন্দের বুনো হাঁস, ঘোড়া প্রেমেন্দ্রর সাপ, হরিণ, বিষ্ণু দের পদধ্বনি, চোরাবালি, শামসুরের প্রান্তর, জেব্রা ইত্যাদি।

পরিশেষে শামসুরের কিছু দুর্বলতার কথা। তাঁর কবিতার সব থেকে বড় দোষ প্রচারধর্মিতা। কোথাও কোথাও বড় statement-ধর্মী হয়ে পড়েছেন তিনি (ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯, ঐকান্তিক শ্রেণীহীনা হরতাল অজস্র

মাইক্রোফোন, পার্ক থেকে যাওয়া যায় ইত্যাদি)। বিপ্লবাত্মক কবিতা বেশ কিছুটা statement নির্ভর হয়, কিন্তু কবি নেপথ্যে না থেকে যদি সামনে এসে পড়েন, তবে ক্লাসিক কবিতার সৃষ্টি হয় না। ক্লাসিসিস্ট রূপেরই সাধনা করেন। রোম্যান্টিসিস্টের সাধনা তো প্রকাশের। শামস্থরের কবিসত্তা অনেক সময় প্রচার বা প্রকাশের রূপকেই উচ্চকিত করে তুলেছে ; উপদেশ বা সারগর্ভ বাণীর সাহায্যে পাঠকমন জয়ের একটা প্রয়াস তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এটা ত্যাগ করতে না পারলে তাঁর কবিতা নিছক document হিসেবে গণ্য হবে, ধ্রুপদী সাহিত্য হিসেবে নয়। ছন্দের মিল বা শব্দ নির্বাচন কোথাও কোথাও দৃষ্টিকটু। "জেদী ঘোড়া" কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে 'এই' ও 'নেই'র অন্ত্যমিল হাস্যকর। 'দাঁত' কবিতায় 'চামড়া'র সঙ্গে অন্ত্যমিল ঘটানোর জন্য 'আমরা' নেহাৎই বাহুল্যমাত্র। 'রাষ্ট্র' কথাটির সঙ্গে 'স্ট্র' জোর করে মেলানো (হৃদয়ের গল্প)। 'দঙ্গলের' সঙ্গে 'জঙ্গলের' মিলও কষ্টাজ্জিত (ঐ)। কথ্যভাষা প্রয়োগের নিপুণ শিল্পী হলেও কোথাও কোথাও তাঁর শব্দনির্বাচন সুপ্রযুক্ত নয়। নূতন শব্দ বসিয়ে চমকে দেবার ঝোঁক আছে তাঁর। "নিদ্রার গহন থেকে পাতার টেরেসে" (প্রকারভেদ) এই বাক্যটিতে "টেরেস" কথাটি শুনতে ভাল লাগছে না (পংক্তিটি কি পাণ্ডিত্যগন্ধী হয়ে যায় নি?)। "বাগ্মিতা নামের / দজ্জাল মেয়ে" (কাজী নজরুল ইসলামের প্রতি) পংক্তিটির চিত্রকল্পটি অবশ্যই সুন্দর কিন্তু বাগ্মিতার সঙ্গে যেন দজ্জাল কথাটি খাপ খায় না। দুপুরের লাল এজলাসে দুলে জারুলের শাখা / করেছিল জজিয়তি খুব (কতবার ভাবি)। কথ্যভাষার এক্সপেরিমেণ্ট করতে গিয়ে কোথাও কোথাও কবি বড় বেশি গদ্যগন্ধী করে ফেলেছেন। "আকাশের পেটে বোমা মারলেও ছাই এক কাচ্চা / বিদ্যেবুদ্ধি বেরোবে না" "হাঁড়ি ঠেলে ঠেলে দ্রুত জননী হচ্ছেন ফোঁত" "আকাশের দিকে চেয়ে থাকি ফ্যালফ্যাল" ইত্যাদি পংক্তি অবশ্যই কাব্যের উপযোগী নয়।

নির্দেশিকা

(১) আধুনিক বাংলাকাব্য পরিচয় : দীপ্তি ত্রিপাঠী (২) আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা : বাসন্তী কুমার মুখোপাধ্যায় (৩) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দের কাব্যাদর্শ : অরুণ ভট্টাচার্য (উত্তরসূরি, ৫ম বর্ষ নব পর্যায় ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৬৫, গ্রন্থ : কবিতার ধর্ম ও বাংলা কাব্যের ঋতুবদল) (৪) পূর্ববাংলার সাহিত্য, কবিতা : হাসান মুরশিদ (দেশ ৪, ১৮ ও ২৫ আষাঢ়, ১৩৭৮)।

শম্ভু মিত্র

অরুণ ভট্টাচার্য

সূর্যাস্ত মানে ছায়া

আসলে সূর্যাস্ত মানে ছায়া
সূর্যোদয়ে তোমার প্রকাশ।
যেন কিছু ঢাকা থাক, কিছু অর্থহীন।

তবে যদি রহস্যের চাবিকাঠি
তোমার হাত থেকে
কোনদিন খুলে নিতে পারি!

শোভন সোম

সাম্প্রতিক

বর্তমান ॥ দিয়েছিলে যে বিষ-চুম্বন
ভরেছিল গরলে যৌবন—
সে এখন তোমারই সতীন
তুমি আজ আড়ালে মলিন।

দাম ॥ যখন কবিতা লিখতাম, আমি
সে কথা তখন লিখি নি—
তখন লিখলে সবাই বলতো
এ সব নগ্ন সত্য

এখন লিখলে সবাই বলবে
অতি নির্জল মিথ্যে !
হিসেবে মেলে না কোনো কালে,
আর মূল্যও যায় পালটে ।

৫ বিভ্রম ॥ আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি, কোথায় !
যেখানে সূর্যের দেশ থেকে যায় চাঁদের জাহাজ
সেখানে !
কিন্তু, না, তার চোখ ছিল রহস্যে সবুজ ।
তাহলে কোথায় আমি দেখেছি, কোথায়
মনে পড়ছে না,
তিনি যে অ্যালবামে আজও আঠারোর দীপ্ত
ফোটোগ্রাফ !

বটকৃষ্ণ দে

সমর্পিত সময়ে, হৃদয়ে

১. 'যখন প্রথম ধরেছে কলি
আমার মল্লিকা-বনে'
কুড়ির ঘুম ভাঙলো,
সেই থেকে উত্তর চল্লিশে
এসে, আজ রাত্রিদিনে, ঘুমে জাগরণে
সেই তেমনি দক্ষিণের বারান্দায়, হাওয়ায়,
প্রণয় নমিত ভাবনায়,

অন্তলীনা প্রীতিচারণায়
স্মৃতিতে, আকৈশোর তৃষ্ণায়, চাওয়ায়
পাওয়া না পাওয়ায়—
শুধু তুমি, তুমি।

২. কৃষ্ণচূড়ার উষ্ণতায় লাল
ভোরের শিশিরে বিভোর শিউলি
গোপন গহন বেদনায় উন্মন!
শরতে, শুভ্রতায়
গুঞ্জিত চঞ্চলতায়,
কৃষ্ণ ভ্রমরের তৃষ্ণা কেঁদে মরে,
উষ্ণ, উষ্ণ কৃষ্ণচূড়ায়:
কৃষ্ণ-কৃষ্ণ রাধা-মন উন্মন!

প্রকৃতি ভট্টাচার্য

দুটি কবিতা

১. তিন আঙ্গুলে তিল তুলসী তণ্ডুলে
অর্ঘদানে যে স্পৃহা তাও নেই।
আঙ্গুলে অন্তরায় শুধু;
ইচ্ছেগুলি ভেবে ভেবে
কি ভীষণ এক ঠাট্টা নিয়ে
দিনরাত রাতদিন ওঠাবসা ঘোরাফেরা…
তবু মন মানে না।

২. ঘরের দুঃখে ঘর ছাড়িলাম
বাইরে এসে একি ?
ঘরেও যা বাহিরে তা
দুঃখ আমার পিছু হাঁটে ঠিকই।

রত্নেশ্বর হাজরা

প্রেমিক নই

হুইস্‌ল্‌ বাজিয়ে ভাঙবো খেলা (যখন খেলার বহু বাকি)
ফিরে এসে শেখাবো ম্যাজিক—পৃথিবীর অর্ধেক প্রেমিক
হৃৎপিণ্ড ঠেকিয়ে খায় বিষ—।
আমি কি প্রেমিক ! কিন্তু যুবরাজ (সাম্রাজ্য ছাড়াই)
ক্ষীর নদীকূলে রাত্রি শুরু হলো
যেতে দাও—যাই……

পুরোনো মৌচাকে ছিল সাপ (হয়তো সেগুলো পোষা), তুমি
নিজের ফুসফুস ফেলে চুরি করে নিয়েছ মৌচাক—
আমার শস্যের খেতে ছেড়েছ ইঁদুর—কাল—না জানিয়ে
মাকড়সা নিংড়িয়ে এনে ওষুধের মতো রাখলে রঙিন শিশিতে।
তোমার নাভিতে কিন্তু বেড়েছে কস্তুরী—খুব দামী
হাওয়ায় লোকেরা গন্ধ পায়—। আমি পাই—।
তোমার কস্তুরী থেকে একটু মাখিয়ে দাও আমার নাভিতে
ক্ষীরনদীকূলে স্বয়ংবর
আমি যাবো—যাই………

প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘুমের ভেতরে যদি

ডক্‌টর আর নয়, আমাকে কোলকাতায় যেতে দিন
আমাকে কোলকাতা ফিরে যেতে দিন। কিছুতেই নয়,
কিছুতেই ঘুমোতে পারি না আমি এই সাহারায়
এই শূন্য মন কতক্ষণ এখানে টেঁকে?
বালির সাহারার আর উথালিপাথালি ঢেউ
অবিরাম সমুদ্রের হাহাকার। কার—
সারাক্ষণ দাউ দাউ চিতা কোথায় জ্বলছে
কোথায় কেঁদেই চলেছে কে সমুদ্রগভীরে
কতক্ষণ টেঁকে মন?
সব বিস্বাদ! স্বচ্ছ কাঁচ-পাত্রে-রাখা বস্তুর মত
জ্ঞানযোগে যদি দেখা যায় সব অবিরত
সত্য মিথ্যা ভালোলাগা, ছলনায় ঝলকানো
প্রেমের বিনয়—অভিনয়—অতি অভিনয়
কতক্ষণ টেঁকে মন?
কিছুতেই নয়, কিছুতেই ঘুমোতে পারি না আমি
উলঙ্গ আলোতে। ঘুমের ওষুধ দিন আমাকে
কোলকাতা ফিরে যেতে দিন।
ছোট ছোট ঘর আলো অন্ধকারে ভেজা মাটি
একতলা উঠোনে লেবু গাছ, লেবু ফুলে লেবু গাছ গন্ধবহ।
দুঃসহ যন্ত্রণা, দুর্গন্ধ নর্দমা যদিও সহরে, তার পাশে তবু
একটি নিতান্ত বিড়ালীও ভালো, তার সদ্য-জাত শিশুতে মগ্ন
সে খেলুক শিশুকে নিয়ে, আমি দেখি।
সন্ধ্যায় চারতলা ফ্ল্যাটের ওপর থেকে, আরো ওপরের

একফালি প্রতিপদ চাঁদ, আর ওরাই আমাকে বাঁচাতে পারে
এই ক্ষয় রোগ থেকে। কোলকাতা যেতে দিন।
চাঁদকে ভাঙতে চাই না দূরযানে গিয়ে, নির্বায়ু চাঁদের গহ্বরে
ঢুকে শ্বাসরোধী যন্ত্রণায় বেঁচে থাকা, বেঁচে মরা
এ যুগের যন্ত্রণার প্রতীক হিসেবে। না চাঁদকে ভাঙতে চাই না।
ভীষণ নিঃসঙ্গ রাত, কালো ওড়নায় সর্বাঙ্গ ঢেকে
নামছে নিয়তি। ভীষণ নির্মম রাত। নিয়তি
নামছে। নামছে নামছে। নামছে আমার চোখের উপর তীব্র
তুষার কঠিন হাত। ভীষণ নীরব রাত।
ভীষণ নিঃসঙ্গ রাতে আমি অসহায় শিশু!
ঘুমের গভীরে এসে একবার হাত ধরো যদি তুমি স্বপ্ন
এ সময়ে! তোমাকে দেখতে চাই!
রক্তাক্ত গোলাপটি ব্যাকুল ছিলো, সে শুধু তোমারি
ঘুমের গভীরে যদি একবার, একবার তোমাকে দেখতে * * *।

পরিমল চক্রবর্তী

ভুলে যেও না

ভুলে যেও না,
এখন তোমার অস্তিত্বের চতুর্দিক ঘিরে
নিষেধের কঠিন পাহারা।

একে একে অনেক মুহূর্ত-ঘণ্টা, দিনরাত্রি,
সপ্তাহ-মাস-বৎসরের সীমানা পেরিয়ে,
অনেক ঋতুপরিবর্তনের চিহ্ন জীবনে ধারণ করে,

অনেক বাসনাবিধুর ফাল্গুনের উপহার শরীরে সাজিয়ে,
যে-উদ্যানে তুমি আজ উপনীত হয়েছো সহসা—
মনে রেখো,
তার নাম যৌবন।
অতএব সতর্ক হও।
অতএব সতর্ক হও
কেননা এখন তোমাকে নিয়ে
অনেক গুঞ্জন কানে আসে,
অনেক সতৃষ্ণ চোখ
অন্ধকারে কামাতুর শ্বাপদের মতো
দপ্ করে জ্বলে উঠে দিগ্বিদিকে ভয়ংকর আগুন ছড়ায় ;
কেননা এখন অনেক পশু
মানুষের রূপ ধরে তোমার সান্নিধ্য পেতে চায়।
অতএব সতর্ক হও।
এখন তোমার অস্তিত্বের চতুর্দিক ঘিরে
নিষেধের রক্তাক্ত পরিখা ॥

দেবী রায়

সুটকেশের ডালা

সুটকেশের ডালা খুললেই যেনো জেগে উঠবে ফের
শৈশবের স্মৃতি, অর্থাৎ ঘুড়ি ও লাটাই রাংতা ছিপি
একরাশ রকমারী ধূলিমলিন বেলুন লাল নীল

স্যুটকেশের ডালা খুললেই যেনো জেগে উঠ্‌বে ফের
আলো আঁধারে উষ্ণ-যোগাযোগ-যুক্ত এক বাণ্ডিল চিঠি
আশা-নিরাশায় দুলে উঠবে দুলে স্যুইংডোর যেনো।

স্যুটকেশের ডালা খুল্‌লে হঠাৎ জেগে উঠতে পারে :
ঘুমন্ত তীব্র ভয়ংকর স্মৃতি, কালনাগিনীর সেই
ভীষণ ছোবল, তরল গরল, জ্বলে যাবে দেহমন !!

বিজয় কুমার দত্ত

সম্পর্কিত

নতুন প্রেমের কাছে আর কোন দিন
দীক্ষিত হব'না এই অভিমান থাকে যতকাল
ততদিনই সুখে থাকা : নিরপেক্ষতায়
এত স্বস্তি, এত শান্তি—জীবনের আশ্চর্য অমোঘ
অভিনব স্বাদ-গন্ধ-তৃপ্তি নিয়ে আসে।
আমি তাই, অতিসূক্ষ্ম স্পর্শ রাখি জনসমাগমে
নিজেকে ছড়িয়ে রাখি দৃশ্যময় পটভূমিকায়
বহুদূর ধানক্ষেত পক্ক আসা রৌদ্রের উত্তাপে
গোধূলি বেলার ক্ষীণ অস্বচ্ছ আলোয়
যেখানে স্বপ্নের মত ছুঁয়ে যায় প্রখর ইন্দ্রিয়
নতুন পুরনো সব রক্তাভ ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে
এই ম্লান প্রতিবিম্ব আজীবন ভেসে যেতে থাকে।

শরৎসুনীল নন্দী

এখানে

এখানে হাঁটু মুড়ে বসে আছে প্রহৃত বালক
এখানে যৌবন বড়ো কাঙালের মতো
মুঠোয় রেখেছে গুচ্ছ ফুল,
এইখানে ফিরে আসতে হয় বারবার
শুকোয় সমস্ত ঘাস
ঝরে যায় শাখা ও প্রশাখা।

বীতশোক ভট্টাচার্য

তার গান

অজ্ঞান গীতিকাগুচ্ছ, সফলতা, অন্ধকার ডালে
মাত্র একবার ঝোলে ; তারপরই লুব্ধ ঝরে যায় ;
যেন কোনো অভিপ্রায়ে লালক্ষত, সচ্ছিদ্র বাসনা
বালুকা শোষণ করে ; সন্ধ্যা হলে কারুণ্যরঞ্জিত
তারা গণনার শেষে কিছুটা আচ্ছন্ন ঘর, তেমন ফেরার

তাম্রপথ পেতে দিলে মূল দেশে পাথর প্রবাহ
জমে ওঠে ধূম্র স্রোতে, যে পত্রালি কদাপি পাতাল
ছোঁবে না, তাদেরি দূর ব্যবহৃত অর্থ আবিষ্কারে
প্রক্ষিপ্ত মদিরাপাত্র, আর পাতা ধূম্রাধার পাতা
শ্বাসরোধী তিক্তস্বাদ, ভয়ে তোলে শীর্ষ ছাইদান।

আর সে একাকী শাদা, নির্জন বসন্তবনে জ্যোৎস্নার নিঃশ্বাস
তপ্ত বিস্মৃতির বাষ্প ত্যাগ করে, তরল মুকুরে ;
ঢেউএর উপরে যেন পুনর্বার ঝাউয়ের উল্লাসে
উঠে আসতে চেয়ে বায়ু······বস্তুপুঞ্জ অভ্যস্ত হননে :
তবুও নিজস্ব গান, কান তারই, গুপ্তলিপি তারই দেওয়ালে।

প্রদীপ মুন্সী

১. অন্য কোন দিন

আজ নয়
তোমার কাছে বরং কাল যাব
আজ আমি নিজেকে বিকিয়েছি অল্পদামে
গলায় জটিল নীলামের ফাঁস জড়িয়ে
পায়ে কাদা, প্রতিমার পায়ে মাথা ঠুকেছি
করতলে হিসেবের রজত কাঞ্চনে রক্তের ছিটে
সকালের উত্তাল রক্ত রুক্ষ চোখ ছাই ছাই
তোমাকে মলিন দেখাবে
কাল নয়
অন্য কোন দিন দেখি যেতে পারি

২. আসছিল

ওরা দশদিক ঘিরে
শরীরে
সংঘের উলকি চিহ্ন খোঁজে
গায়ে কোন দাগ নেই দেখে

ক্রুদ্ধ অস্ত্রের
বেড়া বেঁধে উন্মত্ত উল্লাসে ফিরে যায়
মাথায় আকাশের জল
চোখে সবুজের আভা
আসছিল আমাদের কাছে

শান্তা চক্রবর্তী

অপরাহ্ণ

অপরাহ্ণ ঢলে পড়ে, ছায়াগুলো
জানালার গরাদ পেরিয়ে মুছে যায়।
স্মৃতিরা পেছন দিকে মুখ ফিরে হাঁটে।
নিরিবিলি বয়সের অন্ধকারে
সব কিছু ঢাকা পড়ে।
জলের আড়াল থেকে
ঢেউগুলি সরিয়ে সরিয়ে
হাতের মুঠোয় ভরে সুখ ;
চোখ মেলে দাঁড়াবে সে বিষণ্ণ শার্শিতে ভর দিয়ে
মুখের দর্পণে তোমার
ভালবাসা, সুখ-শান্তি এসব মাখানো ;
তবু শোন আমি অসহায়,
ভয়ঙ্কর ভয় পেয়ে কেঁদে ফেলি।
শুধু বলি, এই অবসর ছাড়া
বুঝি আর সময় পেলে না ?
অপলক চোখ চেয়ে ম্লান হেসে
বলে ওঠ, এতদিন আমারো তো সময় ছিল না।

পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত

প্রস্তাব

ভুল হয়েছে, প্রস্তাবিত সময়ের মধ্যমাঠে
নেবে আসবে আকাশ,
আকাশ কি গ্রহ আবরণ ?

তুখোর বাতাস ছুটে যাবে নিরাময় দেশে
এখানে পৃথিবী, মঙ্গলের পচা জলে ভেসে উঠেছিল
মরা মথ,
স্বপ্নে তবু কোন প্রজাপতি মথের শরীরে ছিলো।
পূর্বসর্ত পুরে যাচ্ছে স্বাক্ষরিত তুলোট কাগজে।

অতীন্দ্র রায়

নিয়তি

হে আমার শেফালিতলার ফুল, কেন
স্বপ্নে গন্ধে নিয়ে যাও দূরে
পৃথিবীর লালমাটি, শালবন, খোয়াই নদী
সবাই কেমন থাকে, অবিকল ঠিকঠাক।

হে আমার শেফালিতলার ফুল, একদিন
ভুলে যাব পূর্ণিমা উঠেছিল ত্রস্ত পায়ে,
সেদিন তুমিই আমার প্রেম, স্রষ্টা ঈশ্বরী।

ভারতচন্দ্র প্রসঙ্গে

নাটক লিখে নিজের দেশে ইবসেন একসময় বিস্তর গালাগালি খেয়েছেন, তাঁকে দেশ পর্যন্ত ছাড়তে হয়েছিল। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে তিনি সাহিত্যের নামে নর্দমার পাঁক ঘাটছেন, যাচ্ছেতাই নোংরামি ছড়াচ্ছেন। কিন্তু সাহিত্যের পালে উল্টো হাওয়াও লাগে। বার্ণাড শ দীর্ঘ এক আলোচনায় ইবসেন সম্পর্কে সমস্ত চিন্তাধারাটাই পাল্টে দিলেন, তারপর গত পাঁচ ছয় দশক ধরে সারা পৃথিবী জুড়ে ইবসেনের নাটক নিয়ে কম হইচই হয় নি। এই কোলকাতাতেই ইবসেনের দুটি নাটকের এখনও নিয়মিত অভিনয় হচ্ছে।

বার্ণাড শ'য়ের ঐ কৃতিত্বের কাছাকাছি ঘটনা বাংলা সাহিত্যে বেশী নেই। বিষ্ণু দের একটি অসাধারণ ছোট প্রবন্ধ আছে, যাতে তিনি ঈশ্বর গুপ্তকে একেবারে নতুন জমিতে এনে রেখেছেন, তারপর ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কে অনেকের কথার সুরই পাল্টেছে। দ্বিতীয় ব্যাপারটি ঘটালেন শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু ভারতচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর বইটিতে।*

আমরা যাঁরা আধুনিক সাহিত্য নিয়ে নাড়াচাড়া করি তাঁদের একটা সাধারণ ধর্ম পুরোনো বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে একটু তাচ্ছিল্য করা। এই ভুল বুদ্ধদেব বসুও করেছেন। এখনো অনেকে করেন, হয়তো কারণও আছে। পুঁথিসামগ্রীর একটা বড় অংশই সাহিত্যের দিক থেকে অপাঠ্য। কিন্তু পাঠ্যও কিছু আছে, যেমন এই ভারতচন্দ্র। এক্ষেত্রে তাচ্ছিল্যের সবচেয়ে বড় কারণ উপযুক্ত মূল্যায়নের অভাব। এই ভারতচন্দ্র সম্পর্কেই এর আগে অনেক আলোচনা হয়েছে, অনেকে ডিগ্রী পেয়েছেন। বেশ কিছু ছাত্র ও শিশুপাঠ্য প্রবন্ধের বইও লেখা হয়েছে, কিন্তু সব সেই দেড়শ বছরের পুরোনো তর্ক, অশ্লীলতা কতখানি! খেউর কতখানি! তারপর তুলক

বা ভূজঙ্গপ্রযাত ছন্দ, সবশেষে রবীন্দ্রনাথের কথা 'রাজকণ্ঠের মনিমালা' — লেখা সমাপ্ত। ছাত্রদের ভীষণ কাজে লাগছে, লাইব্রেরীতে বই রাখা যায় না, কে যেন পাতা কেটে নিয়ে যায়, পরীক্ষায় ভীষণ প্রয়োজন। কিন্তু যে কবিকে নিয়ে লেখা তিনি রইলেন অন্ধকারে।

শঙ্করীবাবু ভারতচন্দ্রকে যথার্থ অর্থে প্রথম আলোতে আনলেন। জন্মের আড়াইশ বছর পর ভারতচন্দ্র এই প্রথম নিজের পায়ে দাঁড়ালেন এবং ঠিক জায়গায় দাঁড়ালেন, — এটাই সমালোচকের কাজ, বার্ণাড শ ইবসেন সম্পর্কে এইটুকুই করেছিলেন।

তবে এখানেই শঙ্করীবাবুর কৃতিত্বের শেষ নয়। প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন, বাংলা সাহিত্যে গুণপনাযুক্ত ছিবলেমির বড় অভাব। আজকাল এই অভাব বড় ভয়ংকর অবস্থায় এসেছে, অধিকাংশ সমালোচকই থান ইঁটের মত গম্ভীর, অতি সীরিয়াস ভঙ্গীর প্রকোপে অতি সাধারণ লেখা পড়তেও শ্বাসকষ্ট হয়। শঙ্করীবাবু এই কষ্ট থেকে বিরাট মুক্তি দিয়েছেন। পদে পদে বুদ্ধিদীপ্ত পরিহাস লেখাটিকে যথার্থ অর্থে পাঠ্য করে তুলেছে, উপন্যাসের মত সবটা পড়ে ফেলা যায়।

আলোচনার দুই অংশ। প্রথমে ভারতচন্দ্র সম্পর্কে গত দুশ বছরে নানা নামজাদা লোকের অভিমতের সুশৃঙ্খল উদ্ধৃতি ও বিশ্লেষণ, দ্বিতীয় অংশে লেখকের নিজের আলোচনা। প্রচ্ছদ বেশ ভালো, ছাপাও নির্ভুল।

রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য্য

---

* শ্রীমদনমোহন গোস্বামী ভারতচন্দ্র সম্পর্কে পূর্বেই গবেষণা করেছেন।
সম্পাদক : উত্তরস্মৃরি।